বৌদ্ধদের দেবদেবী

ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

সম্পাদনা
ড. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ
১৩৬২ আশ্বিন

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অক্ষরবিন্যাস
কম্পোজিট
৩৪/২ বাজেশিবপুর রোড, হাওড়া ৭১১ ১০২

মুদ্রাকর
এস. এস প্রিন্ট
৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

চিরায়ত সংস্করণ : সম্পাদকের ভূমিকা

প্রখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের পঞ্চাশ বছর আগে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি বাংলাভাষায় বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্বের ওপর প্রথম প্রামাণ্য বই। বিষয় ও তথ্যগুরুত্ব আজও অপরিসীম। কৌতূহলী বাঙালি সাধারণ পাঠক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস ও মূর্তিকলার ছাত্রদের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এই বইটি অনেকদিন আগেই নিঃশেষিত হওয়ার দরুন বিস্মৃতির অতলে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। জন্মশতবর্ষে বিনয়তোষের রচনাবলীর সংকলন করতে গিয়ে বইটির পুনঃপ্রকাশের কথা চিন্তা করি। সঙ্গত কারণেই চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্তৃপক্ষ এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য ড. সুজিত বসুর তরফে গ্রন্থন বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক সুধেন্দু মণ্ডল অনুমতি দিয়েছেন বিনয়তোষ-পুত্র প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ অমিয়কুমার ভট্টাচার্যকে নবকলেবরে মুদ্রণের জন্য। প্রথম সংস্করণের ছবি ছাড়াও কয়েকটি নতুন মূর্তিচিত্রও সংযোজন করা হয়েছে বইয়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। বরোদার রাজ্য সংগ্রহশালা, ভারতীয় জাদুঘর এবং বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে এবং ডাঃ অমিয় কুমার ভট্টাচার্যকে কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশকের তরফে। বিনয়তোষের প্রাঞ্জল রচনাশৈলীর কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। তবে গ্রন্থশেষে পাঠকের সুবিধার্থে পরিশিষ্টতে পরিবেশিত হয়েছে হস্তমুদ্রা, আসন ও মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি টীকাটিপ্পনী।

নিবেদন

বাংলার সাহিত্যজগতে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহা সত্ত্বেও বিশ্বভারতীর কর্মকর্তৃগণ আমার উপর এই গ্রন্থ প্রণয়নের ভার দিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বাংলার সাহিত্য-মাতৃকা আমার সেবা গ্রহণ করিলে আমি ধন্য হইব।

যে বিষয়ের চর্চা এই গ্রন্থে করা হইল তাহা অতি গহন ও বিশাল, সেইজন্য 'নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিতমুচ্যতে'—এই নীতির অনুসরণ করিতে হইয়াছে।

যাঁহারা ছবি দিয়াছেন, বা যে সংস্থায় সংরক্ষিত মূর্তির ছবি এই পুস্তকে ছাপা হইয়াছে তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শাস্ত্রী-ভিলা

নৈহাটি

গ্রন্থকার

সূচিপত্র

চিরায়ত সংস্করণ : সম্পাদকের ভূমিকা	৩
নিবেদন	৪
চিত্র-পরিচিতি	৭
আলোকচিত্র	(১-২০ পৃষ্ঠা)
ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য : জীবন ও রচনা	৯
উপোদ্‌ঘাত	১৩
আদিবুদ্ধাদি মূলদেবতা	২৮
বোধিসত্ত্বমণ্ডল	৩৭
বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী	৪৫
বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর	৫০
অমিতাভকুল	৫৯
অক্ষোভ্যকুলের দেবগণ	৬৩
অক্ষোভ্যকুলের দেবীগণ	৭৪
বৈরোচনকুল	৮২
রত্নসম্ভবকুল	৮৭
অমোঘসিদ্ধিকুল	৯২
সমজাতীয় দেবতা	৯৭
দার্শনিক দেবতা	১১১
বৌদ্ধবেশে হিন্দুদেবতা	১২১
উপসংহার	১৩৬
সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সূচি	১৪০
পরিশিষ্ট	১৪১

চিত্র-পরিচিতি

পৃষ্ঠা সংখ্যা / প্লেটের ক্রমিক

চিত্র-পরিচয়

১/অ

বজ্রাসন (কলকাতা জাদুঘর)

২/আ

আদিবুদ্ধ বজ্রধর (বরোদা মিউজিয়ম)

২/ই

আদিবুদ্ধ বজ্রধর (বরোদা মিউজিয়ম)

৩/ঈ

ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য (বরোদা মিউজিয়ম)

৩/উ

ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য (বরোদা মিউজিয়ম)

৪/ঊ

বজ্রসত্ত্ব [তিব্বতীয়] (বরোদা মিউজিয়ম)

৪/ঋ

মঞ্জুশ্রী (বরোদা মিউজিয়ম)

৫/ঌ

বজ্ররাগ মঞ্জুশ্রী (বরোদা মিউজিয়ম)

৫/এ

ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর (বরোদা মিউজিয়ম)

৬/ঐ

ষড়ক্ষরী পরিবার (সারনাথ মিউজিয়ম)

৬/ও

লোকনাথ (বরোদা মিউজিয়ম)

৭/ঔ

লোকনাথ (বরোদা মিউজিয়ম)

৭/ক

হেবুক (বরোদা মিউজিয়ম)

৮/খ

বিঘ্নান্তক (বরোদা মিউজিয়ম)

৮/গ

নৈরাত্মা (কলকাতা জাদুঘর)

৯/ঘ

নামসংগীতি (নেপাল)

৯/ঙ

মারীচী (কলকাতা জাদুঘর)

১০/চ

বজ্রবারাহী (বরোদা মিউজিয়ম)

১০/ছ

চুন্দা (বরোদা মিউজিয়ম)

১১/জ

বসুধারা (বরোদা মিউজিয়ম)

১১/ঝ

খদিরবণী তারা (বরোদা মিউজিয়ম)

১২/ঞ	১২/ট
ক্ষর্পণ্য লোকেশ্বব	আদিবুদ্ধ বজ্রধারা
১৩/ঠ	১৩/ড
অক্ষোভ্য	বৈরোচন
১৪/ঢ	১৪/ণ
লোচনা	বজ্রধাত্বীশ্বরী
১৫/ত	১৫/থ
অমিতাভ	রত্নসম্ভব
১৬/দ	১৬/ধ
অমোঘসিদ্ধি	পাণ্ডরা
১৭/ন	১৭/প
মামকী	আর্যতারা
১৮/ফ	১৮/ব
বজ্রসত্ত্ব [মূর্তির সম্মুখ দিক] (ইয়ুব্-ইয়ুম্)	বজ্রসত্ত্ব
১৯/ভ	১৯/ম
বজ্রসত্ত্ব [মূর্তির পৃষ্ঠ দিক] (ইয়ুব্-ইয়ুম্)	সিংহনাদ লোকেশ্বর
২০/য	২০/র
জম্ভলা	পর্ণশবরী

ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য : জীবন ও রচনা

এক সুপণ্ডিত পিতা পুত্রকে লিখলেন—'আমি একটা মূর্তি পাইয়াছি। তোমার বই ও সাধনমালা দেখিয়া আমার বোধ হইয়াছে মহত্তরী তারা। আসনপিঁড়ি হইয়া বসা। পায়ের দুই তেলোই উপরদিকে। মুকুট আছে, কুণ্ডল আছে, একটা হাতে বরদ আর একটা পদ্ম থাকা উচিত, কিন্তু পদ্মটা স্পষ্ট নয়। জোড়া পদ্মের উপর বসা। নাইয়ের নীচে থেকে কাপড়। মূর্তিটা কোন দেবতার? বজ্রপর্যঙ্কাসন কি? অর্ধপর্যঙ্কাসন কি? বজ্রপদ্মাসন কি?' জিজ্ঞাসু পত্রলেখক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রাপক ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। একজন বৌদ্ধগান ও দোহার পুনরুদ্ধার করে বাংলাসাহিত্যের সূচনাপর্বকে হাজার বছর আগে ফিরিয়ে দিয়েছেন ; অন্যজন ভারতে বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের অবিসংবাদী পথিকৃৎ।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম বই 'দ্য ইন্ডিয়ান বুদ্ধিস্ট আইকনোগ্রাফি' প্রকাশিত হবার পর বৌদ্ধ মূর্তিচিন্তায় নতুন করে কৌতূহল সৃষ্টি হয় পণ্ডিতমহলে। আট দশক পর আজও এই বই ভারতের বৌদ্ধ প্রতিমাবিদ্যা চর্চার এক আকর গ্রন্থ। এরপর বৌদ্ধ ধর্মের দেবদেবীর ধ্যানরূপের সংকলন 'সাধনমালা' দুটি খণ্ডে (১৯২৫ এবং ১৯২৮) সম্পাদনা করেন বিনয়তোষ। শুধু এই দুটি কীর্তিই তাঁকে ভারততত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে অমর করে রাখতে পারত তবে বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রসাধনা বিষয়ে তাঁর মৌলিক এবং সম্পাদিত গ্রন্থ যেমন, 'গুহ্যসমাজতন্ত্র', 'নিষ্পন্নযোগাবলী' এবং 'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু বুদ্ধিস্ট এসোটারিজম্' বিনয়তোষের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় বহন করছে। 'প্রিমিটিভ বুদ্ধিজম টু মহাযান' নামে আরও একটি গ্রন্থের খসড়া রচনা করেছিলেন তিনি। (বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ 'বিনয়তোষিনীতে' প্রকাশিত। সম্পাদনা শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী) সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। এই রূপরেখা থেকেই বোঝা যায়, অত্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ও বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন এই

বইটিতে। সব মিলিয়ে তাঁব গ্রন্থসংখ্যা কুড়ি এবং প্রবন্ধাবলী দুশোর বেশি। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন এই তিনধর্মের মূর্তি ও চিত্রকলা, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও চিকিৎসাশাস্ত্র, রত্নবিদ্যা এবং যোগশাস্ত্র তাঁর রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য বিষয়সূচি।

বর্ধমান জেলার দেয়াশিন গ্রামে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি বিনয়তোষের জন্ম। পিতা হরপ্রসাদ, মাতা হেমন্তকুমারী। বিনয়তোষের পৈত্রিক বাসস্থান নৈহাটির শাস্ত্রীভিলা। পরিবারের কুলপঞ্জী 'আওয়ার অ্যানসেস্ট্রি'-র ভূমিকায় তিনি জানিয়েছিলেন—নৈহাটির ভট্টাচার্য পরিবার বাংলার অন্যতম প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশ যার প্রথম পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে। হর্ষবর্ধন সে সময় চিনদেশের সঙ্গে দূতিয়ালি করছেন! বাইশ বছর বয়সে স্বর্ণপদক পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পি এইচ-ডি হন বিনয়তোষ। ১৯২৪ সালে তাঁর কর্ম জীবনের সূচনা বরোদায়। এরপর ভারততত্ত্ব গবেষণার অন্যতম পীঠস্থান গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট-এর ডিরেকটর এবং গ্রন্থাগার ও প্রকাশনের প্রধান হিসেবে দীর্ঘদিন সারস্বত-সেবায় ব্রতী থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে অবসর নিয়ে নৈহাটিতে ফিরে আসেন। প্রাচীন পুথিপত্তর সম্পাদনা ও তার সটিক সংস্করণ প্রকাশনার জন্য দেশে বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিরল কর্মদক্ষতা এবং পাণ্ডিত্যের জন্য বরোদার রাজা তৃতীয় সয়াজিরাও গায়কোয়াড় তাঁকে 'রাজ্যরত্ন' এবং 'জ্ঞানজ্যোতি' উপাধিতে ভূষিত করেন। আঞ্চলিক ভাষায় কলা ও বিজ্ঞানচর্চা প্রসারের দায়িত্ব নিয়ে মারাঠি ও গুজরাতি প্রকাশনের অনেক উন্নতি করেন বিনয়তোষ।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত এই মানুষটির বিশেষ আগ্রহ ছিল জ্যোতিষবিদ্যা এবং দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতিতে। আধুনিক কালের 'বিকল্প চিকিৎসা'র পথিকৃৎ বিনয়তোষের লেখা রত্নচিকিৎসা, ত্রিদোষ ও হোমিওপ্যাথি, চুম্বক ও টেলিথেরাপির গ্রন্থমালা আজও কৌতূহলী পাঠকের চাহিদা মেটাচ্ছে।

বরোদা এবং কলকাতায় তিনি পীড়িত মানুষের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছিলেন। প্রতিদিন অগণিত মানুষ আসতেন এই কিংবদন্তি-চিকিৎসকের কাছে রোগের উপশমের জন্য।

বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁর নিবন্ধগুলো বেশ আকর্ষণীয়। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখছেন—বিষ্ণুমন্দিরে যাবার পথে চণ্ডালের ছোঁয়া লাগলে আবার স্নান করে শুদ্ধ হবার কোনও বিধান নেই শাস্ত্রে! সবিস্তারে শুনিয়েছেন সেযুগে জন্মদিনের উৎসবগুলো কেমন হত! প্রশ্ন তুলেছেন—সংস্কৃত কী মৃতভাষা? প্রাচীন শিলালিপি ও সাহিত্য থেকে উদ্ধার করেছেন সেকালের লেখা চিঠিপত্রের নমুনা। অতীতকালের 'লাক্সারি বেড' বা আরাম বিছানার কথাও লিখতে ভোলেননি তিনি। আদর-আপ্যায়নের সময় সুপারিদানের রীতি থেকে শুরু করে একাদশ শতাব্দীতে ভোজরাজার সভায় বাঙালি কবির কথাও লিখেছেন বিনয়তোষ। আবার দশাবতারের জন্ম তারিখ, হিন্দু দেবমূর্তির বকলমে বৌদ্ধদেবতা নিয়েও প্রবন্ধ রচনা করেছেন বিনয়তোষ। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন বরোদা থেকে বেতার কথিকায়; এমন কি দার্শনিক পয়গম্বর প্রসঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ রচনাও লিখেছেন তিনি। (শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'সিলেক্ট ওয়ার্কস অব বিনয়তোষ ভট্টাচার্য' দ্রষ্টব্য)

মূলত ইংরেজি ভাষায় তাঁর রচনাগুলো লেখা হলেও বাংলায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। প্রকাশিত দুটি রচনা—'শক্তির সাধনা' এবং 'মন্ত্র'। আর ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বিনয়তোষ লিখেছিলেন 'বৌদ্ধদের দেবদেবী'। পঞ্চাশ বছর পরও বাঙালি পাঠকের কাছে সেই বইটির গুরুত্ব একটুও কমেনি।

১৯৬৪-র ২২ জুন অল্প রোগভোগের পর নৈহাটিতে ড. বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের প্রয়াণ হয়।

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী

উপোদ্‌ঘাত

শাস্ত্রের আবশ্যকতা

মানুষ চিরদিনই কৌতূহলী। তাহার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সংসারে অনন্তশাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। মূর্তিশাস্ত্রও সেই অনন্তশাস্ত্রের অন্যতম। যেখানে দেখা যায় সেইখানেই মূর্তি রহিয়াছে। নানাপ্রকারের মন্দির নানাস্থানে রহিয়াছে। প্রত্যেকটির ভিতর এক বা ততোধিক মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। নানান দেশের জাদুঘরে নানান মূর্তি সংরক্ষিত রহিয়াছে। কখনও কখনও ঘরের ভিত খুঁড়িবার সময়, কখনও-বা পুষ্করিণী খনন করিবার সময়, কখনও-বা নদীর জলে জমি ধসিয়া যাইবার সময়, কখনও পুরাতন শহরের খোদকাজের সময় মূর্তি বাহির হইয়া থাকে। সেই মূর্তিগুলি কি, কোন্ দেবদেবীর, সেগুলি কোন্ সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল, কোন্ ধর্ম অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের হাতের অস্ত্রশস্ত্রগুলি কি এবং কেন দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলির শিল্পকর্ম কি ধরনের, এবং তাহার সহিত অন্য শিল্পের সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে এবং দর্শকের মনে স্বতঃই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। মূর্তিশাস্ত্র এইসকল নানামুখী প্রশ্নের উত্তর দিবার যথাসাধ্য প্রয়াস করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন মন্দিরে, বিভিন্ন জাদুঘরে এবং বিভিন্ন পুরাতন শহর খুঁড়িবার সময় প্রাপ্ত মূর্তি সাধরণত তিন ভাগে বিভক্ত। এই ভাগগুলি প্রধানত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম অনুসারে করা হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্মের অনুযায়ীরা নানাপ্রকারের মূর্তির কল্পনা করিয়াছিলেন এবং ভাস্কর দ্বারা বহুবিধ মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া মুখ্য ও গৌণ দেবদেবী রূপে মন্দিরে সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। মূর্তিশাস্ত্রের সেইজন্য প্রধান কর্তব্য মূর্তিগুলি

ধর্ম অনুসারে বিভাগ করা এবং মূর্তিগুলির কোন্‌টি হিন্দু কোন্‌টি বৌদ্ধ এবং কোন্‌টি জৈন তাহা ঠিক করা।

মূর্তি বলিতে আমরা একটি প্রতীক বা নিদর্শন বলিয়া মনে করি। এই প্রতীক কোন্‌ ধর্মের কোন্‌ সভ্যতার, কোন্‌ দর্শনের এবং কোন্‌ তত্ত্বের তাহা ঠিক করা মূর্তিবিদের কার্য। এই গ্রন্থে অবশ্য হিন্দু ও জৈন মূর্তি ছাড়িয়া দিয়া কেবল বৌদ্ধমূর্তির পরিচয় দেওয়া হইবে। বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্রও এক প্রকাণ্ড সমুদ্র বিশেষ। এরূপ গ্রন্থে বিস্তারিত বিবেচনা করা সম্ভবপর নহে। তাই মোটামুটি এবং অতি প্রয়োজনীয় গুটিকতক তথ্যই প্রকাশ করা যাইতে পারে।

এককথায় মূর্তি দেখিলেই তাহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া শাস্ত্রের মুখ্য উপকারিতা, তাহা বোধ হয় পাঠকদের বলিয়া দিতে হইবে না। এই গ্রন্থ যে শুধু শিক্ষার্থীগণের উপকারে আসিবে তাহা নহে, যাঁহারা মূর্তি লইয়া নাড়াচাড়া করেন এমন প্রত্নতাত্ত্বিকগণেরও কাজে লাগা সম্ভব।

মালমসলা

মূর্তিশাস্ত্রের মালমসলা দুই তরফ হইতে পাওয়া যায়। এক তো পাওয়া যায় নানাপ্রকারের প্রস্তরনির্মিত ধাতুনির্মিত মূর্তি হইতে এবং মন্দিরে বা পুথিতে অঙ্কিত ছবি হইতে। দ্বিতীয় প্রকারের মালমসলা পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাহিত্য ধর্ম ও তন্ত্রগ্রন্থ হইতে। এইসকল গ্রন্থে দেবদেবীর নানা-প্রকারের ধ্যান এবং মূর্তিকল্পনা পাওয়া যায়। পুস্তক হইতে প্রাপ্ত ধ্যানের সঙ্গে যখন প্রস্তর বা ধাতুমূর্তি সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায় তখনই মূর্তির আসল পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মূর্তির ধ্যানের সহিত প্রস্তর বা ধাতুমূর্তির এতটুকুও তফাত থাকা উচিত নহে। যদি থাকে তাহা হইলে দেবতার পরিচয় অসম্পূর্ণ এবং সময়ে সময়ে ভ্রান্ত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্রের ভিত্তি বস্তুত একখানি তন্ত্রগ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রন্থের নাম সাধনমালা। সাধনমালার যতগুলি পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে একখানি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। এই পুথিখানি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে। পুথিখানির একটি পাতায় নেবারি সংবতে গ্রন্থসংগ্রহের তারিখ দেওয়া আছে। এই তারিখটি ২৮৫ নেবারি সংবৎ, অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দ ১১৬৫। সাধনমালায় ৩১২টি সাধনায় অগণিত দেবদেবীর বর্ণনা, মূর্তির ধ্যান এবং পূজাপদ্ধতি, মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রয়োগাদি দেওয়া আছে। এই পুস্তকখানি বরোদার গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এখন সে পুস্তক নিঃশেষিত এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

আর-একখানি বিশেষ দামি পুথি নিষ্পন্নযোগাবলী। এ পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন একজন প্রাচীন বাঙালি পণ্ডিত। তাঁহার নাম মহাপণ্ডিত অভয়াকর গুপ্ত। তিনি বিক্রমশীল মহাবিহারে গবেষণার কার্য করিতেন এবং বিস্তর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সময় ১১৩০ খ্রিষ্টাব্দের সন্নিকটে। নিষ্পন্নযোগাবলীতে প্রায় ছয় শত দেবদেবীর বিবরণ দেওয়া আছে, এবং প্রত্যেকটি মূর্তিকল্পনা মূর্তিবিদদিগের কাছে মহামূল্যবান।

প্রস্তরের মূর্তি, ধাতুমূর্তি ও চিত্রে অঙ্কিত মূর্তি প্রায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের যে যে স্থানে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, কিংবা যে যে স্থানে বৌদ্ধপন্থী রাজাদের রাজত্ব ছিল সেই সকল স্থান হইতেই মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। বহুস্থানে প্রাচীন ভগ্নাবশেষ খুঁড়িয়া বাহির করিবার সময়ও প্রচুর বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সারনাথ, ওদন্তপুরী বিহার, বিক্রমশীল বিহার, কুক্কুটপাদগিরি, নালন্দা, বুদ্ধগয়া,

পাহাড়পুর, মহোৎসবপুর বা মহোবা, কুশীনগর, শ্রাবস্তী ইত্যাদি বহু স্থানের খননকার্য করিবার সময় অগণিত মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, রাস্তায় ঘাটে দেওয়ালে মন্দিরে যে কত বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। বাংলায় বিহারে আসামে উড়িষ্যায় এবং উত্তর প্রদেশে এইরূপ বহু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্তিগুলি মূর্তি-শাস্ত্রবিদদিগের এবং ভারতবাসীদের বহুমূল্য সম্পদ। বড়োই সুখের বিষয় যে, মূর্তিগুলি সযত্নে সরকারি জাদুঘরগুলিতে রক্ষিত হইতেছে। সরকারি জাদুঘরগুলির মধ্যে কলকাতা পাটনা লক্ষ্ণৌ সারনাথ নালন্দা ও ঢাকার জাদুঘরই উল্লেখযোগ্য। এইগুলিতে নানাপ্রকারের বিচিত্র বৌদ্ধমূর্তি সংরক্ষিত রহিয়াছে। রাজশাহি খিচিঙ ও ময়ূরভঞ্জের জাদুঘরগুলিতেও কিছু কিছু বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশি ও বিভিন্ন প্রকারের দেবতামূর্তি, চিত্র প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি এবং বৌদ্ধ সাহিত্য, দর্শন ও তন্ত্রের সংগ্রহ কেবল নেপালেই দেখিতে পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, নেপালে এখনও বৌদ্ধধর্ম জীবিত অবস্থায় বর্তমান। সেইজন্য এইস্থানে মহাযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধদিগের সংখ্যা অনেক বেশি। তাঁহারা এখনও শাস্ত্রোক্ত রীতিতে পূজা পাঠ ইত্যাদি করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকের ঘরেই কিছু-না-কিছু দেবপ্রতিমা পূজার জন্য রক্ষিত থাকে। কাঠমাণ্ডুতে এবং নিকটবর্তী ললিতপত্তন শহরে শত শত বৌদ্ধ মঠ ও বিহার আছে। এইসকল বিহার এক-একটি জাদুঘরবিশেষ। কোনো কোনো বিহারে পাঁচ শতাধিক প্রস্তর ও ধাতু মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্তিবিদদিগকে এইসকল বিহার স্বর্গের আনন্দ দিয়া থাকে। যেসকল মূর্তি কোথাও পাওয়া যায় না, যেসকল দেবতা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইসকল মূর্তি ও দেবতা নেপালের

বিহারগুলিতে পাওয়া যায়। ইহা কম ভাগ্যের কথা নহে।

তিব্বত চিন মাঞ্চুরিয়াতে বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এইসকল দেশের বজ্রযানী বৌদ্ধেরা মূর্তিপূজক হিসাবে ভারতীয়দিগের শিষ্য ছিলেন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মাঞ্চুরিয়ার পিকিং শহরে রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন কয়েকটি মন্দির আছে। এই মন্দিরে প্রায় দুই সহস্র বৌদ্ধ দেবতার ধাতুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্তিগুলির নিম্নে চিন ও তিব্বতি ভাষায় তাহাদের নাম খোদাই করা আছে। এই মূর্তিগুলির ছায়াচিত্র আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ওয়াল্‌টার ইউজিন ক্লার্ক সাহেবের নিকট পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তিনি গবেষণা করিয়া মূর্তিগুলির উপর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পুস্তকখানির নাম *Two Lamaistic Pantheons*, ইহা দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। মূর্তিশাস্ত্রের গবেষকদিগের নিকট এই পুস্তক একটি অমূল্য সম্পদ। দেখা গেল যে, পিকিঙের এই মূর্তিগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় ছাঁচে প্রস্তুত এবং নিষ্পন্নযোগাবলীতে প্রদত্ত ধ্যান অনুসারেই শিল্পীরা বেশির ভাগ মূর্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও তিব্বতে বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়, তাহাদের ভিতর কতক কতক ভারতবর্ষে লোপ পাওয়া সত্ত্বেও তিব্বতে রক্ষিত আছে। চিন জাপান মঙ্গোলিয়াতেও কিছু কিছু বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। এগুলির রূপকল্পনা ভারতেই হইয়াছিল। তাহা ছাড়া খাঁটি তিব্বতি চৈনিক জাপানি মাঞ্চুরীয় মূর্তি প্রচুর তৈয়ারি হইয়াছিল এবং এখনও পাওয়া যায়; এ বিষয়ে এ স্থানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

দেবদেবীর উৎপত্তি

এখন বিচার করা যাক, বৌদ্ধদের দেবদেবীর উৎপত্তি কী প্রকারে হইল

এবং কীভাবেই বা তাহাদের মূর্তি কল্পিত হইল। এই বিষয়ে অনুধাবন করিতে হইলে বৌদ্ধ তন্ত্রসাহিত্যের শরণাপন্ন হইতে হয়। বৌদ্ধতন্ত্র মতে সৃষ্টির আদি ও অকৃত্রিম উৎপত্তিস্থল একমাত্র শূন্য। এই শূন্যের অর্থ সৎ বিজ্ঞান ও মহাসুখ, অর্থাৎ শূন্য চিৎসদৃশ ও আনন্দস্বরূপ। এই শূন্য ঘনীভূত হইয়া প্রথমে শব্দরূপে দেখা দেন এবং পরে শব্দ হইতে পুনরায় ঘনীভূত হইয়া দেবতা রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদের আদি তন্ত্র গুহ্যসমাজগ্রন্থে এই বিবর্তনের একটি জাঁকালো বিবরণ দেওয়া আছে। সেখানে দেখা যায়, কায়বাক্‌চিত্তবজ্র সমাধি গ্রহণ করিতেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাধিতে সমাধিস্থ হইবার পর এক-একটি শব্দ উত্থিত হইতেছে। এবং এই ধ্বনি ক্রমশ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া এক-একটি ধ্যানী-বুদ্ধ-আকারে পরিণত হইতেছে।

জগতের কারণ রূপে শূন্য আপনাকে প্রথমে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। এইগুলিই স্কন্ধ নামে পরিচিত এবং হিন্দুদিগের পঞ্চভূতের ন্যায় জগৎকারণরূপে গণ্য হইয়া থাকে। এই পঞ্চস্কন্ধের নাম — রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্কন্ধ ও অনাদি অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান এবং স্বভাব তাহাদের শূন্যাত্মক। কর্মবশে যখন এই পঞ্চস্কন্ধ একত্র হয় তখনই দৃশ্যমান জীবে পরিণত হইয়া থাকে।

শূন্যকে বজ্রযানে 'বজ্র' আখ্যা দেওয়া হয়। তাহার কারণ শূন্য বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, সারবান, ছিদ্ররহিত, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহী ও অবিনাশী। শূন্যের নামই বজ্র এবং যে মার্গে শূন্যের সহিত মিলিত হওয়া যায় তাহাকেই শূন্যযান বা বজ্রযান বলা হয়। বজ্রযানের অনুগামীরা এক পৃথক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

দেবমূর্তির দর্শন ও দেবদেবীর পূজা বজ্রযানের এক বিশেষত্ব। যেহেতু

দেবতার দর্শন না হইলে তাঁহার রূপ জানা যায় না, তাই তাঁরা দেবতার দর্শনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু, দেবতার দর্শন সহজসাধ্য নয়। ইহার জন্য দরকার অধ্যাত্মজ্ঞান অত্মোন্নতি এবং আধ্যাত্মিক সাধনা। সেই জন্য সাধন-মার্গে বজ্রযানীরা এককালে ব্রতী হইয়াছিলেন। সাধনার জন্য দরকার হয় শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা। এবং দেবতা-দর্শনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ। জগৎ শূন্যময় বলিয়া সতত ভাবনা, এবং জগতের কল্যাণের জন্য সতত করুণাদ্রচিত্ত হওয়াও এই সাধনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। যাঁহাদের এই গুণগুলি আছে তাঁহারা বৌদ্ধই হউন বা অন্য ধর্মাবলম্বীই হউন, দেবতা দর্শন করিতে সক্ষম হন।

প্রথমত, শরীর শুদ্ধি করিয়া একটি পবিত্র ও নির্জন স্থানে বসিয়া সাধনা করিতে হয়। যে দেবতার দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা হয় সেই দেবতার মন্ত্র জপ করিতে হয় এবং তাহার বীজমন্ত্র হৃদয়দেশে চিন্তা করিতে হয়। কিছুদিন অভ্যাসের পর চিত্ত স্থির হয় এবং সাধনার সময় দেবতা ছাড়া ও তাহার মন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো দিকে মন ধাবিত হয় না। তাহার পর দৃঢ়চিত্তে একান্ত মনে ধ্যান ও জপ করিতে করিতে জাপক ক্রমশ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান। যখন ইন্দ্রিয়াদির বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় তখন তাহাকে সমাধি বলে। এই সমাধিতে সম্পূর্ণ সুষুপ্তি অবস্থা আনয়ন করে। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় মানব তাহার সময় যাপন করিয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয় বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রাখিয়া থাকে; স্বপ্ন অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সকল সক্রিয় থাকে; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় কোনোরূপ চেতনা থাকে না। এই সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয় এবং সেই সময় মানব শক্তির ভাণ্ডার পরমাত্মার নিকট হইতে নিজের প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ

করিয়া থাকে। বৌদ্ধদের কথায় জীবাত্মা বোধিচিত্ত বা করুণা ও পরমাত্মা শূন্য বজ্র বা আদিবুদ্ধ।

যখন সাধক দেবতা-দর্শনের উদ্দেশে ধ্যান ও জপ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান, তখন তাঁহার বোধিচিত্ত শূন্যের সহিত মিলিত হয়। শূন্যের সহিত মিলিত হইবার পর ক্রমশ পাঁচ প্রকারের নিমিত্তের দর্শন হইয়া থাকে। প্রথমে চিত্তাকাশে মরীচিকার দর্শন হয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে ধূমের আকার দর্শন হইয়া থাকে; তৃতীয় পর্যায়ে খদ্যোতিকার ন্যায় আলোকবিন্দুর দর্শন হয়, চতুর্থ পর্যায়ে একটি দীপালোকের ন্যায় দৃশ্য দেখা যায় এবং পঞ্চম বা শেষ পর্যায়ে সতত আলোক দেখিতে পাওয়া যায়—সেটা দেখিতে সম্পূর্ণ মেঘশূন্য আকাশের ন্যায়।

এইরূপে ক্রমশ ধ্যানমার্গে অগ্রসর হইলে পূর্ণসমাধি আসে এবং সেই সময়ে সাধক হঠাৎ যে দেবতার সাধনা করিতেছেন সেই দেবতার দর্শন লাভ করেন। আরও এই মার্গে অগ্রসর হইলে দেবতাকে সর্বদাই দেখিতে পান এবং নিজেকেও সেই বেদতারূপে অনুভব করিতে পারেন। এবং এই দেবতা-যোগের ফলে উত্তরোত্তর শক্তিসঞ্চয় করেন এবং নানাপ্রকার লৌকিক ও অনুত্তর সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

জগৎ কারণ শূন্য সদাসর্বদা পবিত্র ও শুদ্ধ স্বভাব। তাহার কোনোরূপ বাসনা নাই। বোধিচিত্ত বাসনাযুক্ত এবং অনেক প্রকারের। বাসনার তীব্রতায় শূন্য ভাবনা করিলে শূন্যের যে বিকার হয় তাহা সেই বাসনা অনুযায়ীই হইয়া থাকে। এক বাসনায় যেমন এক দেবতার দর্শন হয় সেইরূপ অন্য প্রকারের বাসনায় অন্য প্রকার দেবতার উদ্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ নানাপ্রকারের বোধচিত্ত হইতে নানাপ্রকার দেবদেবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাসনার যেহেতু অন্ত নাই, সেইহেতু দেবতাও অনন্ত। এই অনন্ত দেবতা লইয়াই দেবসংঘ গঠিত হয়।

কিন্তু দেবতা যতই হউক-না কেন তাঁহাদের উৎপত্তিস্থান কিন্তু এক অনাদি অনন্ত শূন্যতা বা বজ্র। ভাবনাবশে শূন্যে স্ফোট বা বুদ্‌বুদ হইয়া থাকে এবং তাহাকে বৌদ্ধেরা 'স্ফূর্তি' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শূন্যের এই স্ফূর্তিই দেবতারূপে দেখা দেয়, কিন্তু তাহারা স্বভাবতই নিঃস্বভাব, ঠিক শূন্যেরই মতো। তাই দেবতারা শূন্যাত্মিকা। বৌদ্ধতন্ত্রে বলে সাধনা করিলে প্রথমে শূন্যতার বোধ হয়, দ্বিতীয়ে বীজমন্ত্রের দর্শন হয়, তৃতীয়ে বীজমন্ত্র হইতে বিম্ব অথবা দেবতার অস্পষ্ট আকার দেখা যায় এবং অবশেষে দেবতার সুস্পষ্ট মূর্তি দর্শন হইয়া থাকে। সে মূর্তি অতি মনোহর সর্বাঙ্গসুন্দর কল্পনার অতীত, স্বর্গীয় বর্ণে রঞ্জিত এবং নানাপ্রকার দিব্য বস্ত্র অলংকার ও অস্ত্রশস্ত্রে শোভিত। একবার দেখিলে তাহা আর জীবনে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

সংক্ষেপে ইহাই বৌদ্ধ দেবতার উৎপত্তির কথা। দেবতাদর্শন একটা আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপার। ইহার জন্য অনেক সময় দিতে হয়, অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, সংযম করিতে হয়, অনেক যোগযাগাদি অভ্যাস করিতে হয়। দেবতার সাধনা যাহারা করিত তাহারা সারা জীবনই এই কার্যে ব্যাপৃত থাকিত। ইহা ছিল তাহাদের মুখ্য পেশা। দেবতাদর্শনকে কিংবা সাধনাকে গৌণ পেশা করা যায় না, করিলেও সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

দেবতাদর্শনের পশ্চাতে এক বিরাট দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। তবে ইহা সকলের জন্য প্রশস্ত মার্গ নহে। ইহা সাধকের মার্গ, যোগীর মার্গ।

মূর্তিপূজার ইতিহাস

বৌদ্ধধর্মের দুইটি মুখ্য বিভাগ আছে। একটি হীনযান ও অপরটি মহাযান। কালক্রমে এই দুইটি যান প্রায় দুইটি বিভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

হীনযান পুরাতন এবং মহাযান আধুনিক। হীনযান বুদ্ধের বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মহাযান দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ দুইটি পন্থের ভিতর নানারূপ বিভেদ আছে। কিন্তু মুখ্যত একটিরই উল্লেখ এখানে করা দরকার। হীনযানে নিজের মুক্তিই প্রধান লক্ষ্যবস্তু, কিন্তু মহাযানে নিজের মুক্তির স্থান নাই। জগতের সকল মনুষ্য পশুপক্ষী ইত্যাদির মুক্তি আগে, তারপর নিজের মুক্তি। জগৎ যতক্ষণ বন্ধনাবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাহাদের মুক্তির জন্য প্রয়াস ও সর্বপ্রকারে ত্যাগস্বীকার করাই বোধিসত্ত্বের প্রধান কার্য।

হীনযানে দেবদেবীর বালাই নাই। এমন কি বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের মূর্তি পর্যন্ত বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় চাবি শত বৎসরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌতম বুদ্ধ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ভ্রাতা নন্দ যখন তাঁহাকে প্রণাম করেন তখন বুদ্ধ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলেন প্রণামাদি দ্বারা তিনি সুখী হইবেন না। তিনি সুখী হইবেন তখনই যখন নন্দ পূর্ণ উদ্যমে সদ্ধর্মেব পালন করিবে।

হীনযানে কিছুকিছু হিন্দু দেবতার নাম পাওয়া যায়। বুদ্ধ যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন সেই সময় ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা আসিয়া সেই দিব্যজ্ঞান পৃথিবীতে প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। তাহা ছাড়া ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গরাজ্যেও দেবতাদের বাস ছিল। কুবের ও বসুধারার নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রাচীন শিল্প সম্প্রদায়ে যদিও বুদ্ধের মূর্তি দেখা যায় না, তথাপি বুদ্ধের ব্যবহৃত বস্তু ও প্রতীকের মূর্তি অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধের পাগড়ি পদচিহ্ন বোধিবৃক্ষ ধর্মচক্র ইত্যাদি বহুবিধ চিহ্ন পাথরে খোদা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধগয়া, সাঁচি, ভারুত ও

অমরাবতীর শিল্পই প্রধান। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে প্রথম শতকের মধ্যে এই সম্প্রদায়গুলি গঠিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত করা হয় নাই। তাহার বদলে তাঁহার প্রতীকগুলিকেই প্রস্তরে খোদাই করিয়া রূপ দেওয়া হইয়াছিল। বুদ্ধগয়ার বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্তের ছবি, মায়াদেবীর স্বপ্ন এবং নানা প্রকারের যক্ষনাগের মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে।

বুদ্ধের মূর্তি কোন্ শিল্পে প্রথম তৈয়ারি হইয়াছিল, ইহা লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন গান্ধার ভাস্কর্যে গ্রিক বৌদ্ধেরা প্রথম ভগবান বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারি করিয়াছিলেন। আবার কোনো পণ্ডিত বলেন মথুরা ভাস্কর্যও প্রথম বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারি করিবার দাবি করিতে পারে। তবে সব দিক অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে প্রথম বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারি করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভবপর নহে, কারণ উহা একটু অসম্মানকর। কাজেই বোধ হয় এ কার্যটি বিদেশীয় বৌদ্ধদিগের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। এ বিষয়ে অধিক বিচার নিষ্প্রয়োজন।

গান্ধার ভাস্কর্যে মূর্তি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সবই বৌদ্ধ এবং বুদ্ধের কাহিনির পরিবেশে নিবদ্ধ। বুদ্ধের নানারূপ মূর্তি নানা মুদ্রায় নানাভাবে নানা অবস্থায় গান্ধারে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়াও জম্ভল মৈত্রেয়, হারীতী এবং বোধিসত্ত্বদের মূর্তিও গান্ধারে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মথুরা ভাস্কর্যেও প্রায় এইসব মূর্তিই দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেগুলির প্রস্তুতপ্রণালী ছাঁচ ও ঢং আলাদা। এখানেও বুদ্ধের নানামুদ্রায় নানাবিধ মূর্তি, তাঁহার জীবনের দৃশ্যাবলী, কুবেরের মূর্তি এবং যক্ষ নাগাদির প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। গান্ধার এবং মথুরা শিল্পকলার নিদর্শনগুলি

অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, গুপ্ত-সময়ের পূর্ব পর্যন্ত হীনযানের প্রভাবই অধিক ছিল এবং মহাযানের দুই-একটি বোধিসত্ত্ব ছাড়া আর কোনো দেবতার বড়ো-একটা লক্ষণ দেখা যায় না। গুপ্তকালেও এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল।

গুপ্তকালের বহু পরে পালদের রাজত্বের সময় বাংলায় এবং বিহারে নানাপ্রকারের মূর্তি প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং এই মূর্তিগুলি অধিকাংশই বজ্রযানের দেবতামণ্ডলের। এই মূর্তিগুলি হইতেই বুঝা যায় যে, বজ্রযান সে সময় পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং বজ্রযানের দেবদেবীরা বিশেষ লোকপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। সারনাথে বিক্রমশীলায় ওদন্তপুরীতে কুর্‌কিহারে বুদ্ধগয়ায় রাঢ়দেশে পূর্ববঙ্গে আসামে ও উড়িষ্যায় অদ্ভুত অদ্ভুত মূর্তি তৈয়ারি হইয়াছিল; এবং এই মূর্তিগুলি ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যেসকল দেবতার মূর্তি এইসকল শিল্পসম্প্রদায়ে দেখা যায় তাহাদের মধ্যে ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর উচ্ছুষ্মজম্ভল মঞ্জুশ্রী তারা অবলোকিতেশ্বর বসুধারা মারীচী পঞ্চধ্যানিবুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব হেরুক পর্ণশবরী ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে।

বাংলা-বিহারের শিল্পকলা মুসলমান-আক্রমণের পর নেপালে গিয়া উপস্থিত হয়। বড়ো বড়ো পণ্ডিত তাঁহাদের পুথিপাঁজি, দেবতার বিগ্রহাদি লইয়া নেপালে পলায়ন করেন এবং সেখানে গিয়া শত শত নূতন মঠ স্থাপন করেন। ইহাতেই কোনোরূপে বৌদ্ধধর্ম ও বজ্রযান বাঁচিয়া যায়। বজ্রযানের দেবদেবীরাও একটু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচেন। বাংলার শিল্পকলা নেবারি শিল্পকলার সংমিশ্রণে নূতন রূপ ধারণ করিয়া এক অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত হয়। নেবারিরা যে কত সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়িয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। একবার নেপালে ভ্রমণ না করিলে তাহা কল্পনা

করা অসম্ভব।

অজন্তা ইলোরা এবং বৌদ্ধগুহাগুলিতেও কিছুকিছু বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা যে তান্ত্রিক বজ্রযানের দেবতাগুলির সহিত বিশেষ পরিচিত ছিল তাহা বোধ হয় না। হয়তো বজ্রযানের অভ্যুদয়ের পূর্বেই এইসকল গুহা নির্মিত হইয়াছিল। কিংবা বাংলা বিহার আসাম উড়িষ্যার বজ্রযান এতদূর তখন পর্যটন করিয়া উঠিতে পারে নাই।

এখন, প্রশ্ন উঠিতে পারে এই তান্ত্রিক বজ্রযানের উৎপত্তিস্থান কোথায় ছিল। তিব্বতিদের ধর্মপুস্তকে বলে, তন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল উড্ডিয়ানে। এই উড্ডিয়ান যে কোথায় ছিল তাহার সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সাধনমালায় উড্ডিয়ান কামাখ্যা সিরিহট্ট ও পূর্ণগিরি এই চারিটি তন্ত্রের মুখ্য পীঠস্থান বলিয়া উল্লেখ আছে। এই চারটি জায়গা বজ্রযোগিনীর পূজার জন্য বিখ্যাত ছিল। খুব সম্ভব এই চারটি পীঠস্থানে বজ্রযোগিনীর একটি করিয়া মন্দিরও ছিল। আসামের কামাখ্যা বিখ্যাত;সিরিহট্ট আজকালকার শ্রীহট্ট; পূর্ণগিরি আসামস্থিত পুণ্যতীর্থের সহিত এক পর্যায়ে কেহ ফেলিয়া থাকেন; কিন্তু চারিটি পীঠস্থানের প্রধান পীঠ উড্ডিয়ানের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব এই উড্ডিয়ানের নাম কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া মূল নামটি লোপ হইয়া গিয়াছে। বিক্রমপুর পরগনায় একটি গ্রাম আছে তাহার নাম বজ্রযোগিনী। বজ্রযোগিনীর মন্দির বা পূজার প্রাধান্য এই গ্রামে ছিল বলিয়া এই বৌদ্ধদেবী বজ্রযোগিনীর নামে গ্রামের নামকরণ করা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। বজ্রযোগিনী দেবীর সহিত উড্ডিয়ানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বজ্রযোগিনীর মন্দির তৈয়ারি হইবার পূর্বে গ্রামটির একটা নাম নিশ্চয় ছিল। সেই নামটি উড্ডিয়ান বলিয়া কল্পনা করাই সমীচীন। যদিও নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

কামাখ্যা সিরিহট্ট পূর্ণগিরি ও উড্ডিয়ানই তন্ত্রের আদি পীঠ। পূর্ববঙ্গ ও আসামই তন্ত্রের আদি স্থান। এই স্থানে তান্ত্রিক বজ্রযানের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং এই স্থান হইতেই নিকটবর্তী প্রদেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নালন্দা বিক্রমশিলা সারনাথ ওদন্তপুরী জগদ্দল ইত্যাদি বিদ্যাপীঠগুলিতে বজ্রযানের অনুশীলন হইত। সেসকল স্থানে তন্ত্র ও যোগমার্গের উপদেশ দেওয়া হইত এবং ছাত্রও তৈয়ারি করা হইত। সমগ্র বাংলায় বিহারে এবং উড়িষ্যায় বজ্রযানের প্রভাব অত্যধিক ছিল এবং এইসকল স্থানেই বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি সর্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর সাধনার কথা গুহ্যসমাজতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই তন্ত্রখানির রচনায় অসঙ্গের কিছু হাত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। অসঙ্গ খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বসুবন্ধু বৌদ্ধ জগতে সুপরিচিত। লামা তারানাথ নামক এক তিব্বতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতে তন্ত্রের উৎপত্তি পূর্বেই হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় তিন শত বৎসর সুপ্ত অবস্থায় ছিল এবং গোপনভাবে গুরুশিষ্যপরম্পরায় লুক্কায়িত ছিল, পাল-রাজত্বের সময় সিদ্ধচার্যদের দ্বারা উহা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রযানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবলভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের আদিতে মুসলমান-আক্রমণ হয় এবং সে সময়ে অনেক মঠ ও বিদ্যাপীঠ ধ্বংস হয়। তাহার পর হইতেই বজ্রযান ভারতে নিষ্প্রভ হইয়া যায় এবং কিছুকাল পরে বিলুপ্ত হয়। বজ্রযানের অনুযায়ীরা হয় হিন্দু সমাজে মিলাইয়া যায়, নয় মুসলমান হইয়া যায়। চৈতন্যদেব অনেককে বৈষ্ণব করিয়া দেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ধারণা ছিল, বৌদ্ধদের ভিতর তন্ত্র ছিল না এবং তাহারা দেবদেবীর

উপাসনা করিত না। কিন্তু এখন তন্ত্রসাহিত্যের গ্রন্থ কিছুকিছু প্রকাশ হওয়ায় সে ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনও সহস্র সহস্র বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। এইগুলি যতদিন না প্রকাশিত হয় ততদিন বজ্রযানের পূর্ণ স্বরূপ জানা সম্ভব হইবে না।

প্রথম অধ্যায়

আদিবুদ্ধাদি মূলদেবতা

১. আদিবুদ্ধ

বৌদ্ধ দেবমণ্ডলের আদি দেবতা আদিবুদ্ধ। ইনিই সৃষ্টির আদি কারণ শূন্য বা বজ্র। ইনি সর্বব্যাপী সর্বকারণ সর্বশক্তির আধার এবং সর্বজ্ঞ। সৃষ্টির প্রত্যেক অণুপরমাণুতে ইনি বিদ্যমান, সেইজন্য সৃষ্টির সমস্ত বস্তুই স্বভাবশুদ্ধ শূন্যরূপ নিঃস্বভাব ও বুদ্‌বুদস্বরূপ। কেবল শূন্যই নিত্য। আদিবুদ্ধ সেই শূন্যের রূপকল্পনা। আদিবুদ্ধ হইতেই পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের উদ্ভব। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ পাঁচটি স্কন্ধের অধিষ্ঠাতা।

আদিবুদ্ধ যখন দেবতাকারে কল্পিত হন তখন তাঁহার নাম হয় বজ্রধর এবং তিনি কমলের উপর ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকেন। তাঁহার দুইটি হস্ত বক্ষের উপর বজ্রহুঁকার মুদ্রায় সজ্জিত হয় এবং হাত দুইটিতে বজ্র ও ঘন্টা থাকে। বজ্র থাকে দক্ষিণ হস্তে ও ঘণ্টা থাকে বাম হস্তে। পরিধানে থাকে বিচিত্র বস্ত্রাদি এবং তিনি সকল প্রকার অলংকারে ভূষিত হন। তাঁহার শক্তি প্রজ্ঞাপারমিতার সহিত কোনো কোনো স্থানে তাঁহাকে যুগনদ্ধ মূর্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে শক্তির দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি ও বামে কপাল থাকে। বজ্রধরের মূর্তি দুই প্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে। — একটি একক মূর্তি ও অপরটি যুগনদ্ধ মূর্তি। একটি শূন্যমূর্তি ও অপরটি বোধিচিত্ত-মূর্তি। একটি শূন্যতা ও অপরটি করুণা। একটি পরমাত্মা, অপরটি জীবাত্মা। যতক্ষণ দ্বয়ভাব বর্তমান থাকে ততক্ষণ দুইটি মূর্তি দেখা যায়। এই দ্বয়ভাব যখন অদ্বয়ে পরিণত হয় তখন দুইটি মিলিয়া এক হইয়া যায়, যেমন লবণ জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া একমাত্র জলে পরিণত হয়।

২. ধ্যানীবুদ্ধ

ধ্যানীবুদ্ধ পাঁচটি—বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, আমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। এক-একটি ধ্যানীবুদ্ধ এক-একটি স্কন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বৌদ্ধমূর্তি-শাস্ত্রে ধ্যানীবুদ্ধের স্থান সর্বোচ্চ, কারণ ধ্যানীবুদ্ধ হইতেই বুদ্ধশক্তির উদ্ভব হয়, এবং তাহা হইতে বোধিসত্ত্বদিগের উৎপত্তি হয়। বোধিসত্ত্বের সংখ্যা অনন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং তাঁহারা সকলেই একটি-না-একটি ধ্যানীবুদ্ধ কুল বা বংশের অন্তর্ভুক্ত হন। বোধিসত্ত্বেরা স্ব স্ব পরিচয় প্রদানচ্ছলে নিজ নিজ কুলেশের একটি ক্ষুদ্রমূর্তি মস্তকের উপর ধারণ করিয়া থাকেন। শিলামূর্তিতে এবং কোনো কোনো ধাতুমূর্তিতে এই ছোটো ধ্যানীবুদ্ধকে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র ধ্যানীবুদ্ধকে দেখিতে পাইলে বোধিসত্ত্বের মূর্তি চেনা সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি-কল্পনা একই প্রকারের। সকলেই ধ্যানাসনে সমাধি অবস্থায় বসিয়া থাকেন। আসনের নীচে কমল থাকে। সকলেরই একটি মুখ এবং দুইটি হাত। তাঁহাদের নেত্র ধ্যানস্তিমিত এবং অর্ধনিমীলিত। তাঁহাদের পরিধানে ত্রিচীবর থাকে এবং সকলেই অলংকাররহিত হন। তাঁহাদের কেবল রং আলাদা এবং মুদ্রা আলাদা। এবং ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন বাহন ও ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকচিহ্ন হয়। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পাথরের এবং ধাতুর মূর্তি প্রভূত পরিমাণে ভারতবর্ষে নেপালে এবং তিব্বতে পাওয়া যায়, এবং সেগুলি চিনিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। মুদ্রা হইতেই প্রধানত ধ্যানীবুদ্ধ-মূর্তি চিনিতে হয়। প্রত্যেকটি ধ্যানীবুদ্ধের বিশেষত্ব নিম্নে লিখিত হইল :

অক্ষোভ্য ।। অক্ষোভ্য ধ্যানীবুদ্ধের উৎপত্তি বিজ্ঞানস্কন্ধ হইতে।

'বজ্রধৃক' মন্ত্রপদ হইতে তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার বর্ণ নীল এবং মুদ্রা ভূমিস্পর্শ। তাঁহার বাহন দুইটি হস্তী এবং প্রতীকচিহ্ন বজ্র।

অমিতাভ ॥ অমিতাভের উৎপত্তি সংজ্ঞাস্কন্ধ হইতে। 'আরোলিক্' মন্ত্রপদ হইতে অমিতাভ-রূপ মন্ত্রপুরুষের আবির্ভাব। ইঁহার বর্ণ লাল এবং মুদ্রা সমাধি। ইঁহার বাহন দুইটি ময়ুর এবং প্রতীকচিহ্ন পদ্ম।

অমোঘসিদ্ধি ॥ আমোঘসিদ্ধির উৎপত্তি সংস্কারস্কন্ধ হইতে। 'প্রজ্ঞাধৃক' মন্ত্রপদ হইতে মন্ত্রপুরুষরূপে আমোঘসিদ্ধির আবির্ভাব। গুহ্যসমাজতন্ত্রে তাঁহার নাম আমোঘবজ্র। ইঁহার বর্ণ সবুজ এবং ইনি অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করেন। ইঁহার বাহন দুইটি গরুড় এবং প্রতীকচিহ্ন বিশ্ববজ্র।

বৈরোচন ॥ রূপস্কন্ধ হইতে ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের উৎপত্তি। 'জিনজিক' মন্ত্রপদ হইতে মন্ত্রপুরুষরূপে বৈরোচনের আবির্ভাব হয়। ইঁহার বর্ণ সাদা এবং ইনি ধর্মচক্র বা বোধ্যঙ্গীমুদ্রা ধারণ করেন। ইঁহার বাহন দুইটি ভীষণাকৃতি সর্প এবং প্রতীকচিহ্ন চক্র।

রত্নসম্ভব ॥ দেবনাস্কন্ধ হইতে ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের উৎপত্তি। 'রত্নধৃক' মন্ত্রপদ হইতে মন্ত্রপুরুষরূপে ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইঁহার বর্ণ পীত এবং ইনি বরদমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহার বাহন দুইটি সিংহ এবং প্রতীকচিহ্ন রত্ন।

বজ্রসত্ত্ব ॥ কখনও কখনও পাঁচটির উপর আর একটি ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধের কল্পনা করা হয়। ইঁহার নাম বজ্রসত্ত্ব এবং ইনি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পুরোহিতরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। বজ্রসত্ত্বের বিগ্রহ দুই প্রকারের, একক এবং যুগনদ্ধ।

ইঁহার বর্ণ সাদা, ইনি মনঃস্বভাব এবং হুঁকার শব্দ হইতে উৎপন্ন হন। ইনি একমুখ ও দ্বিভুজ এবং রাজোচিত বেশভূষা ও অলংকারাদিতে

শোভিত। ইনি কমলের উপর ধ্যানাসনে বসিয়া থাকেন। বক্ষের নিকট দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ করেন এবং বাম হস্তে কটিদেশে ঘণ্টা ধারণ করেন।

যুগনদ্ধরূপে ইনি শক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত হন। সেই শক্তির নাম বজ্রসত্ত্বাত্মিকা। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি এবং বামে কপাল থাকে। নেপালে ও তিব্বতে এই দেবতার বিশেষ খাতির আছে।

৩. ধ্যানীবুদ্ধের শক্তি

প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের একটি করিয়া বিভিন্ন শক্তি কল্পিত হইয়াছে। ইঁহাদের বিবরণ প্রথম গুহ্যসমাজতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে তাঁহাদের নাম বিভিন্ন প্রকারের। পাথরের মূর্তি ইঁহাদের প্রায়ই পাওয়া যায় না, তবে পুথিতে চিত্র কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বেশির ভাগ তাঁহাদের একটি ত্রিকোণাকৃতি যন্ত্র প্রস্তরমূর্তিতে ধ্যানীবুদ্ধের বামপার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়।

চিত্রে তাঁহাদের সকলকেই দেখিতে প্রায় এক। সকলেই সুন্দর রূপ ও লাবণ্যবতী, চন্দ্রের উপর ললিতাসনে বসিয়া থাকেন। তাঁহাদের বর্ণ ও বাহন তাঁহাদের নিজ নিজ ধ্যানীবুদ্ধের অনুরূপ। তাঁহারা সকলেই সাধারণত স্ব স্ব ধ্যানীবুদ্ধের একটি-একটি ক্ষুদ্র মূর্তি মস্তকে ধারণ করেন। তাঁহারা সকলেই এক মুখ ও দুই হস্ত বিশিষ্ট। তাঁহারা দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বাম হস্ত বক্ষের নিকট রক্ষিত হয়। দুই হস্তে পদ্মের নাল থাকে এবং সেই নাল হইতে দুইটি পদ্ম দুই পার্শ্বে উত্থিত হয়। পদ্মের উপর স্ব স্ব ধ্যানীবুদ্ধের প্রতীকচিহ্ন রক্ষিত হয়। বুদ্ধশক্তিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

মামকী ।। বুদ্ধশক্তি মামকী অক্ষোভ্যের শক্তিরূপে পরিগণিত হন।

'দ্বেষরতি' মন্ত্রপদ হইতে ঘনীভূত হইয়া মন্ত্রপুরুষরূপে ইঁহার আবির্ভাব। ইনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য মূর্তি ধারণ করিয়া স্বকুলের পরিচয় দেন এবং দুই পার্শ্বস্থিত পদ্মের উপর অক্ষোভ্যের প্রতীকচিহ্ন বজ্র প্রদর্শন করেন।

পাণ্ডরা ।। বুদ্ধশক্তি পাণ্ডরা বা পাণ্ডরবাসিনী অমিতাভের শক্তিরূপে পরিগণিত হন। 'রাগরতি' মন্ত্রপদ হইতে ঘনীভূত হইয়া মন্ত্রপুরুষরূপে ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র আমিতাভ-মূর্তি ধারণ করিয়া স্বকুলের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহার বর্ণ লাল এবং দুই পার্শ্বস্থিত প্রস্ফুটিত কমলের উপর কুলচিহ্নস্বরূপ দুইটি পদ্ম প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

তারা ।। বুদ্ধশক্তি তারা অমোঘসিদ্ধির শক্তিরূপে গণ্য হন। গুহ্যসমাজের মতে 'বজ্ররতি' মন্ত্রপদ হইতে ঘনীভূত হইয়া মন্ত্রপুরুষরূপে ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র অমোঘসিদ্ধির মূর্তি ধারণ করিয়া স্বকুলের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ইঁহার বর্ণ হরিত বা সবুজ এবং দুই পার্শ্বস্থিত দুইটি পদ্মের উপর কুলচিহ্নস্বরূপ দুইটি বিশ্ববজ্র প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

লোচনা ।। বুদ্ধশক্তি লোচনা বা রোচনা বৈরোচন ধ্যানীবুদ্ধের শক্তিরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। 'মোহরতি' মন্ত্রপদ হইতে ঘনীভূত হইয়া মন্ত্রপুরুষরূপে ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র বৈরোচন মূর্তি ধারণ করিয়া নিজ কুলের পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহার বর্ণ সাদা এবং ইনি দুই পার্শ্বস্থিত দুইটি পদ্মের উপর দুইটি চক্র কুলচিহ্ন স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

বজ্রধাত্বীশ্বরী ।। বজ্রধাত্বীশ্বরী ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের শক্তি রূপে গণ্য হন। গুহ্যসমাজতন্ত্রে 'ঈর্ষ্যারতি' মন্ত্রপদ হইতে ঘনভিূত হইয়া মন্ত্রপুরুষরূপে

ইঁহার আবির্ভাব হয়। ইনি মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র রত্নসম্ভব-মূর্তি ধারণ করিয়া স্বকুলের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহার বর্ণ পীত বা হলদে এবং ইঁহার দুই পার্শ্বস্থিত দুইটি পদ্মের উপর দুইটি রত্নচ্ছটা কুলচিহ্ন স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

বজ্রসত্ত্বাত্মিকা ॥ বজ্রসত্ত্বাত্মিকা ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের শক্তিরূপে পরিগণিত হন। ইঁহার মন্ত্রপদ গুহ্যসমাজে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইঁহার বর্ণ সাদা এবং ইনি দক্ষিণ হস্তে কর্ত্রি ও বাম হস্তে কপাল ধারণ করেন। ইঁহার মূর্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে বজ্রসত্ত্বের যুগনদ্ধ মূর্তিতে ইঁহার রূপ কখনও কখনও দেখা যায়।

এই স্থানে বলিয়া রাখা দরকার যে, কুল বা বংশ হিসাবে বজ্রযানে পাঁচটি কুলই প্রচলিত ছিল। বজ্রসত্ত্বের কোনো কুল ছিল না। কুলপ্রবর্তক ধ্যানীবুদ্ধের একটি করিয়া বিশেষ বর্ণ ছিল এবং ইঁহাদের এক-একটি দিশা নির্দিষ্ট ছিল। যে দেবতা যে বর্ণের প্রায়শ সেই বর্ণের ধ্যানীবুদ্ধের সন্ততিরূপে পরিগণিত। কিংবা মণ্ডলান্তর্বর্তী যে দিশায় যে দেবতা থাকেন, সেই দিশার ধ্যানীবুদ্ধের সন্ততি বলিয়া তিনি গণ্য হন। কেবল বৈরোচনের স্থান মণ্ডলের ঠিক মধ্যভাগে। বজ্রসত্ত্বের বর্ণ সাদা হওয়ায় তিনিও বৈরোচনের রূপান্তর বা তাঁহার কুলভুক্ত বলিয়া অনুমিত হয়।

পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের পাঁচটি কুলের নাম যথাক্রমে: দ্বেষকুল, মোহকুল রাগকুল, চিন্তামণিকুল এবং সময়কুল। দ্বেষকুলের অধিপতি অক্ষোভ্য মোহকুলের বৈরোচন, রাগকুল অমিতাভের, চিন্তামণিকুল রত্নসম্ভবের এবং সময়কুল অমোঘসিদ্ধির। এইভাবে কুলের উৎপত্তি হইয়াছিল। যাঁহারা এই কুলের পূজাপদ্ধতি আচার-ব্যবহার মানেন, তাঁহাদিগকে কৌল বলা হয়। তাঁহাদের পূজাপদ্ধতিকে কুলাচার বলে।

৪. ধ্যানীবুদ্ধের বোধিসত্ত্ব

প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের যেমন একটি শক্তি আছে। তেমনই একটি বোধিসত্ত্ব থাকে। এই বোধিসত্ত্বগুলি মস্তকের উপর ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি ধারণ করিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করেন, এবং স্ব স্ব কুলচিহ্ন ধারণ করেন। তাঁহাদের বর্ণভুজাদি ধ্যানীবুদ্ধেরই মতো, কিন্তু সাধারণত তাঁহারা হয় দাঁড়াইয়া থাকেন না হয় ললিতাসনে উপবিষ্ট থাকেন। তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা রাজোচিত বেশভূষাদিতে বিভূষিত থাকেন। তাঁহাদের বর্ণনা এক এক করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল।

বজ্রপাণি ।। বজ্রপাণি অক্ষোভ্য ধ্যানীবুদ্ধের বোধিসত্ত্ব। তিনি হস্তে বজ্র কুলচিহ্নরূপে ধারণ করেন। একটি ছোটো অক্ষোভ্য মূর্তিও মস্তকে ধারণ করেন। মামাকী ইঁহার মাতৃরূপে পরিগণিত। ইনি বজ্রকুলের অন্তর্গত।

পদ্মপাণি ।। অমিতাভের বোধিসত্ত্বের নাম পদ্মপাণি। ইনি হস্তে পদ্ম ধরিয়া থাকেন এবং তাহা হইতেই বুঝা যায় ইনি পদ্মকুলের অন্তর্গত। অমিতাভের ন্যায় ইঁহারও বর্ণ লাল এবং ইনি কুলেশের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি মস্তকে ধারণ করেন। পাণ্ডরা বা পাণ্ডরবাসিনী ইঁহার মাতৃরূপে গণ্য।

বিশ্বপাণি ।। অমোঘসিদ্ধির বোধিসত্ত্বের নাম বিশ্বপাণি। ইনি কর্মকুলের অন্তর্গত এবং তারা ইঁহার মাতৃরূপে গণ্য। ইনি হস্তে কুলচিহ্ন বিশ্ববজ্র প্রদর্শন করেন। স্বীয় পিতার ক্ষুদ্র মূর্তি মস্তকে ধারণ করেন। ইঁহার রং সবুজ। ইঁহার কুলের আর-একটি নাম সময়কুল।

সমন্তভদ্র ।। বৈরোচনের বোধিসত্ত্বের নাম সমন্তভদ্র। ইনি যে কুল হইতে উৎপন্ন হন তাহার একটি নাম পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। অপর নামটি তথাগতকুল। এই কুলের উৎপাদক বৈরোচন এবং তাঁহার শক্তি লোচনা বা রোচনা। এই কুলোৎপন্ন দেবতাদের রং সাদা এবং ইঁহাদের কুলচিহ্ন চক্র। সমন্তভদ্র সেইজন্য চক্র ধারণ করেন এবং তাঁহার বর্ণ সাদা। তিনি

মস্তকোপরি একটি ক্ষুদ্র বৈরোচন মূর্তি ধারণ করিয়া স্বকুলের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

রত্নপাণি ।। রত্নসম্ভবের বোধিসত্ত্ব রত্নপাণি। ইঁহাদের কুলের নাম রত্নকুল। বজ্রধাত্বীশ্বরী রত্নপাণির মাতৃরূপে পরিগণিত হন। এই কুলোৎপন্ন সকল দেবতার বর্ণ পীত বা হলদে এবং ইঁহাদের কুলচিহ্ন রত্ন। এই রত্ন হয় তাঁহাদের হাতে অঙ্কিত থাকে, কিংবা তাঁহারা রত্ন হস্তে ধারণ করেন। আবার কখনও এই রত্ন পদ্মের উপর রক্ষিত থাকে। সমন্তভদ্রের বর্ণ পীত, তিনি হাতে রত্ন ধরিয়া থাকেন এবং মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র রত্নসম্ভব-মূর্তি ধারণ করিয়া নিজের পরিচয় দেন।

ঘণ্টাপাণি ।। ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের বোধিসত্ত্বের নাম ঘণ্টাপাণি। ঘণ্টাপাণির মায়ের নাম বজ্রসত্ত্বাত্মিকা। ইঁহাদের বর্ণ সাদা, কিন্তু ইঁহাদের কোনো বিশেষ কুল নাই। সম্ভবত সকলেই বৈরোচন কুলের অন্তর্গত। ঘণ্টাপাণি হাতে ঘণ্টা ধারণ করিয়া থাকেন। এই বোধিসত্ত্বের মূর্তি বিরল।

৫. মানুষী বুদ্ধ

সকলেই জানেন গৌতম বুদ্ধ শাক্যসিংহ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। কিন্তু তাহা হইলেই ধর্মটি আধুনিক ও অর্বাচীন হইয়া যায়। তাই বৌদ্ধেরা বলিত বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের পূর্বেও ছিল। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন শেষ বুদ্ধ। তাঁহার পূর্বে অন্তত চতুর্বিংশতি বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধের তালিকা দেখিলে প্রায় বত্রিশটি নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে শেষ সাতটিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং তাঁহাদের মানুষী বুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হয় ।

মানুষী বুদ্ধ সাতটি। তাঁহাদের নাম সময়ের অনুক্রমে বিপশ্যী, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কশ্যপ ও শাক্যসিংহ। এই সাতটি নামের

ভিতর শেষ তিন জন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক মানুষী বুদ্ধের এক-একটি বিশেষ বোধিবৃক্ষ ছিল। মূর্তিতে প্রতিবিম্বিত হইলে সাতজনকেই দেখিতে এক প্রকার। তাঁহাদের বর্ণ এক এবং তাঁহারা ধ্যানাসনে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকেন কিংবা দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহাদের একটি মুখ ও দুইটি হস্ত। বসা মূর্তিতে একটি হস্ত কোলের উপর থাকে আর-একটিতে দক্ষিণে ভূমিস্পর্শমুদ্রা প্রদর্শিত হয়। সাধারণত তাঁহাদের রং পীত স্বর্ণের ন্যায়। তাঁহাদের প্রত্যেকের উপর একটি বোধিবৃক্ষ থাকে। কোনো কোনো মূর্তিতে সাতজনকেই দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো মূর্তিতে ভাবিবুদ্ধ মৈত্রেয়কেও বোধিসত্ত্বরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। মৈত্রেয়ের সম্বন্ধে আরও কথা পরে দেওয়া হইবে।

মানুষী বুদ্ধেরও শক্তি কল্পিত হইয়াছিল। রূপ-কল্পনা হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে: বিপশ্যন্তী, শিখিমালিনী, বিশ্বধরা, ককুদ্বতী, কণ্ঠমালিনী, মহীধরা ও যশোধরা।

সাতটি মানুষী বুদ্ধের সাতটি বোধিসত্ত্বও কল্পিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে আনন্দ ও তাঁহার মাতা যশোধরা পণ্ডিতদিগের পরিচিত। সাতটি বোধিসত্ত্বের নাম যথাক্রমে: মহামতি, রত্নধর, আকাশগঞ্জ, শকমঙ্গল, কনকরাজ, ধর্মধর এবং আনন্দ। ইঁহাদের মূর্তি অলভ্য।

বজ্রযান দেবসংঘে গৌতম বুদ্ধের স্থান প্রায় নাই বলিলেই হয়। যদি তাঁহাকে কখনও প্রতিমূর্তিত করা হয় তাহা হইলে তিনি দেখিতে অক্ষোভ্যের ন্যায় হন। তাঁহার তখন নাম হয় বজ্রাসন। নিষ্পন্নযোগাবলীতে দুর্গতিপরিশোধন মণ্ডলেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে ভগবান বুদ্ধকে 'শ্রীশাক্যসিংহো ভগবান্ মহাবৈরোচনঃ' অর্থাৎ বৈরোচন রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বোধিসত্ত্ব-মণ্ডল

বোধিসত্ত্ব শব্দের দুইটি অংশ, একটি বোধি ও অপরটি সত্ত্ব। বোধি বলিতে জগৎকারণ অনাদি অনন্ত শূন্যের জ্ঞান বুঝায় এবং সত্ত্ব বলিতে সার বা মূল উপাদান বুঝায়। সেই কারণে বোধিসত্ত্ব শব্দের অর্থ যে-সকল দেবতার শূন্যই হইল আসল উপাদান। বোধিসত্ত্ব শূন্যেরই অশেষ গুণের এক-একটি গুণের প্রতিমূর্তি স্বরূপ। উদাহরণস্বরূপ একজন বোধিসত্ত্বের নাম অক্ষয়মতি বা যে মতির ক্ষয় নাই, আর-এক জনের নাম অমিতপ্রভ অর্থাৎ অপরিমিত প্রভাবিশিষ্ট, অপরের নাম সমন্তভদ্র অর্থাৎ সম্পূর্ণ মঙ্গলময় ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায় বোধিসত্ত্ব জগৎ-কারণ শূন্যের এক-একটি গুণের প্রতিরূপ।

মূর্তিশাস্ত্রে বোধিসত্ত্ব একটি বিশেষ শ্রেণির দেবতা। ইঁহারা সকলেই পুং দেবতা। স্ত্রী দেবতাদের শক্তি নামে অভিহিত করা হয়। বোধিসত্ত্বের প্রত্যেকের একটি কুল আছে এবং ইঁহারা সকলেই এক-একটি ধ্যানীবুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। যখন ইঁহাদের মূর্তি প্রস্তুত করা হয় কিংবা রূপ কল্পনা করা হয় তখন তাঁহাদের মস্তকে একটি ধ্যানীবুদ্ধের ক্ষুদ্রমূর্তি দেওয়া হয়। এই ক্ষুদ্রমূর্তি দেখিয়াই তাঁহাদের উৎপত্তি ও কুল স্থির করা হইয়া থাকে। কখনও কখনও বোধিসত্ত্বেরা তাঁহাদের নিজ নিজ শক্তির সহিত বিরাজমান থাকেন। বোধিসত্ত্বের মূর্তি ভারত, নেপাল, তিব্বত ও মাঞ্চুরিয়ায় প্রভূত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণত বোধিসত্ত্বের সংখ্যা ষোলোটি। নিষ্পন্নযোগাবলীতে তিনটি বোধিসত্ত্বের তালিকা দেওয়া আছে। তবে নামগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যায় বোধিসত্ত্বের সংখ্যা ষোলোটিরও কিছু বেশি। নিম্নে তাহাদের

বিবরণ ও মূর্তি-পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হইল। এই মূর্তি-পরিচয় হইতে বোধিসত্ত্ব মূর্তি চেনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে :

সমন্তভদ্র॥ সমন্তভদ্রের বিবরণ একবার পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের কুলসম্ভূত সমন্তভদ্র সাদা বর্ণের। কিন্তু ধ্যান অনুসারে তাঁহার বর্ণ কখনও হলদে কখনও-বা নীল। যখন হলদে রং হয় তখন তিনি রত্নসম্ভবকুলের অন্তর্গত হন, আবার যখন তাঁহার রং কালো বা নীল হয় তখন তিনি অক্ষোভ্যকুলোৎপন্ন হইয়া থাকেন। কোন্ সময় তিনি কোন্ কুলের অন্তর্ভুক্ত তাহা সাধকেই বলিতে পারেন।

ইঁহার মূর্তিকল্পনা নানা প্রকার হয়। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা, বামে উৎপলস্থিত খড়্গ থাকে। কোনো কোনো মূর্তিতে তাঁহার বর্ণ নীল হয় এবং হস্তে রত্ন থাকে।

অক্ষয়মতি॥ অক্ষয়মতি বোধিসত্ত্ব প্রায়শ পীত বর্ণের। ইনি বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় হৃৎপ্রদেশে ধারণ করেন। এবং দক্ষিণে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন। অন্য পক্ষে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে খড়্গ এবং বামে উৎপল সহিত অভয়মুদ্রা দেখানো হয়। পীতবর্ণ ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবকুলের দ্যোতক।

ক্ষিতিগর্ভ॥ ক্ষিতিগর্ভ বোধিসত্ত্ব কখনও পীত বর্ণের কখনও-বা সবুজ বর্ণের। তিনি দক্ষিণ হস্তে ভূস্পর্শ মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বাম হস্তে কল্পবৃক্ষ ধারণ করিয়া থাকেন। অন্য মূর্তিতে কলশ ও অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করেন। পীত হইলে রত্নসম্ভব এবং হরিদ্বর্ণ হইলে অমোঘসিদ্ধি তাঁহার কুলেশ হইয়া থাকেন।

আকাশগর্ভ॥ এই বোধিসত্ত্বের বর্ণ হরিৎ, এবং দক্ষিণ হস্তে সর্বপ্রকার রত্ন বর্ষণ করেন এবং বাম হস্তে চিন্তামণি-রত্ন ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহার হরিৎ বর্ণ অমোঘসিদ্ধির দ্যোতক। ইঁহার আর-একটি নাম খগর্ভ।

গগনগঞ্জ॥ এই বোধিসত্ত্বের বর্ণ হলদে কিংবা লাল। ইনি বামহস্ত সগর্বে কটিতে স্থাপন করিয়া থাকেন এবং দক্ষিণ হস্ত আকাশে ঘুরাইতে থাকেন। অন্য পক্ষে দক্ষিণে চিন্তামণি-রত্ন এবং বামে কল্পবৃক্ষ হইতে অবলম্বিত ঘট ধারণ করিয়া থাকেন। পীতবর্ণ রত্নসম্ভবের এবং রক্তবর্ণ অমিতাভের দ্যোতক।

রত্নপাণি॥ রত্নপাণির রং সবুজ। ইনি দক্ষিণ হস্তে রত্ন ও বামে চন্দ্রমণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সবুজ রং অমোঘসিদ্ধির দ্যোতক। রত্নসম্ভবের পূর্ববর্ণিত বোধিসত্ত্ব রত্নপাণির সহিত ইঁহার কোনো সাদৃশ্য দেখা যায় না।

সাগরমতি॥ এই বোধিসত্ত্ব শ্বেতবর্ণের। ইনি দুইটি হস্তের প্রসারিত অঙ্গুলি দ্বারা সমুদ্রতরঙ্গের অভিনয় প্রদর্শন করেন। পক্ষান্তরে দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ ও বামে বজ্র সহিত খড়্গ ধারণ করেন। ইঁহার সাদা রং বৈরোচন ধ্যানীবুদ্ধের দ্যোতক।

বজ্রগর্ভ॥ ইঁহার বর্ণ নীল কিংবা নীলাভ শ্বেত। ইনি দক্ষিণ হস্তে বজ্র এবং বামহস্তে দশভূমিক পুস্তক ধারণ করেন। পক্ষান্তরে দক্ষিণ হস্তে নীলোৎপল এবং মুষ্টিবদ্ধ বামহস্তে কটিদেশ স্পর্শ করেন। ইঁহার নীল বর্ণ ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

অবলোকিতেশ্বর॥ ইঁহার বর্ণ সাদা। ইনি দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বামে পদ্ম ধারণ করেন। বজ্রযান দেবসংঘে অবলোকিতেশ্বর একজন মহাশক্তিশালী ও জনপ্রিয় দেবতা। ইঁহার ১০৮টি বিভিন্ন মূর্তি কল্পিত হইয়াছিল এবং ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী একটি অধ্যায়ে দেওয়া হইবে। ইনি ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের কুলজাত। কিন্তু ইঁহার সাদা রং বৈরোচনের দ্যোতক।

মহাস্থামপ্রাপ্ত॥ ইঁহার রং কখনও সাদা আবার কখনও হলদে। ইনি দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বাম হস্তে ছয়টি বিকশিত পদ্ম ধারণ করেন। পক্ষান্তরে যখন ইঁহার রং হলদে হয়, তখন ইনি দক্ষিণ করে খড়্গ এবং বামে পদ্ম প্রদর্শন করেন। সাদা রং বৈরোচনের এবং হলদে রং রত্নসম্ভবের দ্যোতক।

চন্দ্রপ্রভ॥ ইঁহার রং সাদা চন্দ্রের ন্যায়। ইনি দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং বাম হস্তে উৎপলোপরি চন্দ্রমণ্ডল ধারণ করেন। পক্ষান্তরে দক্ষিণে বজ্রাঙ্কিত চন্দ্র ধারণ করেন। বামহস্তে চন্দ্রমণ্ডল পূর্বের ন্যায়ই থাকে। সাদা রং বৈরোচনের দ্যোতক।

জালিনীপ্রভ॥ ইঁহার বর্ণ লাল সূর্যের বর্ণের ন্যায়। ইনি দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বাম হস্তে উৎপলোপরি সূর্যমণ্ডল ধারণ করেন। পক্ষান্তরে দক্ষিণ হস্তে অসি এবং বামে সূর্যমণ্ডল থাকে। ইঁহার লাল রং অমিতাভের দ্যোতক।

অমিতপ্রভ॥ ইহার বর্ণ সাদা, কখনও লাল হয়। ইনি দক্ষিণ করে মস্তকোপরি অমৃতকলশ ধারণ করেন এবং বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কটি স্পর্শ করেন। পক্ষান্তরে দুই হস্তে অভিষেকের কলশ ধারণ করিয়া থাকেন। সাদা রং বৈরোচনের এবং লাল রং অমিতাভের দ্যোতক।

প্রতিভানকূট॥ এই বোধিসত্ত্বের রং তিন প্রকার, কখনও সবুজ, কখনও হলদে, আবার কখনও লাল। তিনি যখন সবুজ হন, তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ছড়ি থাকে এবং বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় উৎসঙ্গে স্থাপিত হয়। হলদে রং হইলে দক্ষিণে ছড়ি এবং বামে পদ্মের উপর খড়্গ থাকে। লাল রং হইলে দক্ষিণে পদ্মের উপর মুকুট এবং বাম হস্ত কটিবদ্ধ হইয়া কটিতে ন্যস্ত থাকে। সবুজ বর্ণ অমোঘসিদ্ধির, হলদে রত্নসম্ভবের এবং

লাল অমিতাভের দ্যোতক।

সর্বশোকত-মোনির্ঘাতমতি॥ ইনি কখনও পীতবর্ণ আবার কখনও রক্তবর্ণ বলিয়া বর্ণিত হন। যখন ইঁহার রং পীত হয় তখন ইনি দুই হস্ত সম্পূটযোগে জুড়িয়া প্রহার করিবার অভিনয় করেন। যখন বর্ণ লাল হয় তখন দক্ষিণ হস্তে পঞ্চমুখ বজ্র এবং বামে শক্তি বা বল্লম প্রদর্শন করেন। হলদে রং রত্নসম্ভবের এবং লাল রং অমিতাভের দ্যোতক।

সর্বনিবরণ-বিষ্কম্ভী॥ ইঁহার বর্ণ কখনও সাদা, কখনও নীল। সাদা বা নীল অবস্থায় দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী মিলাইয়া শান্তির অভিনয় করেন; এবং বামে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা প্রদর্শন করেন। পক্ষান্তরে ইঁহার বর্ণ নীল এবং ইনি দক্ষিণ হস্তে কৃপাণ ও বামে বিশ্ববজ্রাঙ্কিত পতাকা ধারণ করেন। সাদা রং বৈরোচনের এবং নীল রং অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

মৈত্রেয়॥ বৌদ্ধধর্মে মৈত্রেয়ের নাম সুবিদিত। বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস মৈত্রেয় এখন বোধিসত্ত্বরূপে তুষিত নামক স্বর্গে বিরাজ করিতেছেন এবং যথাসময়ে তিনি ধরাধামে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হইবেন। মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের রং সোনার মতো হলদে এবং ইনি চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ এই দুই রূপে কল্পিত হন। চতুর্ভুজ অবস্থায় প্রধান দুইটি হস্তে বক্ষের নিকট ধর্মচক্র মুদ্রা ধারণ করেন। অপর দুইটি হস্তে দক্ষিণে বরদমুদ্রা এবং বামে নাগকেশর-পুষ্প সহিত পল্লব ধারণ করেন। দ্বিভুজ অবস্থায় দক্ষিণ হস্তে নাগকেশর-পুষ্প এবং বামে কমণ্ডলু ধারণ করেন। ইঁহার পীত বর্ণ রত্নসম্ভবের দ্যোতক।

মঞ্জুশ্রী॥ বজ্রযান দেবসংঘে মঞ্জুশ্রী একজন মহাশক্তিশালী এবং জনপ্রিয় দেবতা। ইঁহার স্থান অবলোকিতেশ্বরের ন্যায় অতি উচ্চ। একটি

পৃথক অধ্যায়ে মঞ্জুশ্রীর বিষয় বর্ণিত হইবে। বোধিসত্ত্ব-মণ্ডলের দেবতা হিসাবে মঞ্জুশ্রীর রং সোনার মতো পীত। ইনি সাধারণত একমুখ ও দ্বিভুজ। দ্বিভুজ মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী দক্ষিণ হস্তে উদ্যত খড়্গ এবং বামে বক্ষঃস্থলে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহার পীতবর্ণ রত্নসম্ভবের দ্যোতক।

গন্ধহস্তী ॥ বোধিসত্ত্ব গন্ধহস্তী শ্যামবর্ণ। ইনি একমুখ ও দ্বিভুজ। দক্ষিণে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বামে কমলের উপর একটি হস্তীর ছোটো মূর্তি ধারণ করেন। অন্যপক্ষে দক্ষিণ হস্তে গন্ধপূর্ণ শঙ্খ ধারণ করেন এবং তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ বাম হস্ত কটিতে ন্যস্ত হয়। ইঁহার শ্যামবর্ণ অমোঘসিদ্ধির দ্যোতক।

জ্ঞানকেতু ॥ এই বোধিসত্ত্বের বর্ণ কখনও পীত ও কখনও নীল হয়। পীত মূর্তিতে ইনি দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা ধারণ করেন এবং বাম হস্তে চিন্তামণি অঙ্কিত ধ্বজা প্রদর্শন করেন। নীল মূর্তিতে দক্ষিণ হস্তে চিন্তামণি ধ্বজা এবং বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কটিতে রক্ষা করেন। ইঁহার পীত বর্ণ রত্নসম্ভবের এবং নীল বর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

ভদ্রপাল ॥ ভদ্রপাল বোধিসত্ত্বের দুই প্রকার মূর্তি সচরাচর কল্পিত হইয়া থাকে, একটি শ্বেত ও অপরটি রক্তবর্ণের। শ্বেতমূর্তিতে তিনি দক্ষিণ হস্তে সোজ্জ্বল রত্ন প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া কটিদেশে ন্যস্ত থাকে। রক্তমূর্তিতে তিনি দক্ষিণ করে বরদমুদ্রা এবং বাম করে রত্ন ধারণ করিয়া থাকেন। শ্বেতবর্ণ বৈরোচনের এবং রক্তবর্ণ অমিতাভের দ্যোতক।

সর্বাপায়ঞ্জহ ॥ ইঁহার মূর্তি শ্বেতবর্ণের। ইনি দুই হস্তে সকলপ্রকার পাপ দূরে নিক্ষেপ করার অভিনয় প্রদর্শন করেন। পক্ষান্তরে দুইটি হস্তে

শ্বেত অঙ্কুশ প্রদর্শন করেন। ইঁহার শ্বেতবর্ণ অমিতাভকুলের দ্যোতক।

অমোঘদর্শী॥ বোধিসত্ত্ব অমোঘদর্শী পীতবর্ণ শরীর বিশিষ্ট, একমুখ এবং দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে নেত্র সহিত পদ্ম ধারণ করেন এবং তাঁহার বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া কটিতে রক্ষিত হয়। তাঁহার পীতবর্ণ রত্নসম্ভবকুলের দ্যোতক।

সুরঙ্গাম॥ বোধিসত্ত্ব সুরঙ্গাম শ্বেতমূর্তিতে পরিকল্পিত হন। তিনি দক্ষিণহস্তে অসি ধারণ করেন এবং বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কটিদেশে ন্যস্ত করেন। শ্বেতবর্ণ বৈরোচনকুলের দ্যোতক।

বজ্রপাণি॥ বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি বোধিসত্ত্ব-মণ্ডলের অন্তর্গত। ইনি এ স্থলে শ্বেতমূর্তিতে পরিকল্পিত হন। ইনি দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ করেন এবং বাম হস্তে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন। ইঁহার শ্বেতবর্ণ বৈরোচনকুলের দ্যোতক।

এই হইল বোধিসত্ত্ব-মণ্ডলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। নিষ্পন্নযোগাবলীর এক স্থলে ইঁহাদের সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায়, সময়ে সময়ে কয়েকটি বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের কুলেশের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। এই বিবরণ হইতে কয়েকটি বোধিসত্ত্বের কুলের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা :

মৈত্রেয়, অমোঘদর্শী, সর্বাপায়ঞ্জহ, সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতি পূর্ব দিকে অবস্থিত নীলবর্ণের অক্ষোভ্য ধ্যানীবুদ্ধের রূপ ধারণ করেন।

গন্ধহস্তি, সুরঙ্গাম, গগনগঞ্জ ও জ্ঞানকেতু—এই চারিজন দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পীতবর্ণের ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভবের রূপ ধারণ করেন।

অমিতপ্রভ, চন্দ্রপ্রভ, ভদ্রপাল এবং জালিনীপ্রভ— এই চারিজন পশ্চিম দিশায় অবস্থিত রক্তবর্ণ ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের সমানরূপ ধারণ করেন।

বজ্রগর্ভ, অক্ষয়মতি, প্রতিভানকূট এবং সমন্তভদ্র— এই চারিজন উত্তর দিশায় অবস্থিত হরিদ্বর্ণের ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির সমানরূপ ধারণ করেন।

মাঞ্চুরিয়ায় প্রাপ্ত ধাতুমূর্তি-সংগ্রহে এইরূপ মূর্তি বিরল নহে। মনে রাখা দরকার ধ্যানীবুদ্ধ-মূর্তিতে অলংকার বা রাজোচিত বেশভূষা থাকে না, কিন্তু বোধিসত্ত্ব মূর্তিতে বেশভূষা ও অলংকারের প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী

বৌদ্ধ দেবসংঘে মঞ্জুশ্রীর স্থান অতি উচ্চে। যত বোধিসত্ত্ব আছে তাহার মধ্যে মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরই সর্বপ্রধান। মঞ্জুশ্রীর পূজা পদ্ধতি সকল বৌদ্ধ দেশেই বিদ্যমান। ভারতে, নেপালে, তিব্বতে, চিনে, জাপানে, মাঞ্চুরিয়ায় মঞ্জুশ্রীর প্রস্তরমূর্তি এবং ধাতুমূর্তি ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক বলিতে কী মঞ্জুশ্রী পরাবিদ্যা ও পরাজ্ঞানের দেবতা। তাঁহার মূল প্রহরণ দক্ষিণ করে উদ্যত অসি ও বাম করে হৃৎপ্রদেশে রক্ষিত প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক। অসি দ্বারা তিনি সর্বপ্রকার অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা ছেদন করেন। এবং পুস্তক দ্বারা পরাপ্রজ্ঞা বা পূর্ণ শূন্যের জ্ঞান জগতে প্রচার করেন।

মঞ্জুশ্রী একজন অতি প্রাচীন দেবতা। ইঁহার নাম প্রথম দেখিতে পাওয়া যায় অমিতায়ুঃ সূত্রে। এই বইখানির আর-একটি নাম সুখাবতী ব্যূহ। এই বইখানির একটি ছোটো ও একটি বড়ো সংস্করণ ছিল। মঞ্জুশ্রীর নাম এই ছোটো সংস্করণে আছে। এই ছোটো বইখানি চিনা ভাষায় খ্রিস্টীয় ৩৮৪ ও ৪১৭ অব্দের মধ্যে তর্জমা হইয়াছিল। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প বলিয়া একখানি মঞ্জুশ্রীর পূজাপদ্ধতির পুথি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য হইতে ছাপা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি গুহ্যসমাজের পূর্ববর্তী পুস্তক। গুহ্যসমাজ চতুর্থ শতকের পূর্বভাগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইহাতেও মঞ্জুশ্রীর নাম বহুবার পাওয়া যায়। এইসকল তথ্য হইতে মনে হয় মঞ্জুশ্রীর দেবমূর্তি প্রথম খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে কল্পিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে মঞ্জুশ্রীর প্রভাব খুবই বিস্তৃত হইয়াছিল। নেপালে প্রবাদ আছে মঞ্জুশ্রীই প্রথমে

পাহাড় কাটিয়া নেপাল দেশকে বাসযোগ্য করিয়াছিলেন এবং অগ্নিরূপী সয়ম্ভূ দেবতার উপর একটি মন্দির তৈয়ারি করিয়াছিলেন। ইহাকে স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির বলে।

সাধনমালায় মঞ্জুশ্রীর অনেকগুলি সাধনা পাওয়া যায় এবং এইগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় তিনি অনেক রূপে এবং অনেক বর্ণে কল্পিত হইয়াছিলেন। এই রূপকল্পনা ও ধ্যানগুলি অনুধাবন করিলে মঞ্জুশ্রীর নানাপ্রকার মূর্তি চিনিতে কোনোরূপ অসুবিধা হয় না। নিম্নে তাঁহার বিভিন্নরূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

বাক্‌বাবজ্ররাগমঞ্জুশ্রী॥ এই মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী একমুখ, দ্বিভুজ এবং নানারূপ অলংকারে সুশোভিত। ইঁহার বর্ণ শ্বেত এবং ইনি ধ্যানাসনে বসিয়া থাকেন। ইঁহার হাত দুইটি ক্রোড়ের উপর ধ্যান বা সমাধি মুদ্রায় বিন্যস্ত থাকে। ইঁহার শ্বেতবর্ণ বৈরোচনের দ্যোতক এবং এই মূর্তি দেখিতে অমিতাভের ন্যায়।

ধর্মধাতু বাগীশ্বর॥ এই মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী চতুর্মুখ ও অষ্টভুজ। তাঁহার গায়ের রং রক্তমিশ্রিত গৌর এবং তিনি বিচিত্র বেশভূষা এবং অলংকারে সুশোভিত। তিনি মুখ্য হস্তদ্বয়ে ধনু ও শর ধারণ করেন, দ্বিতীয় হস্তদ্বয়ে পাশ এবং অঙ্কুশ, তৃতীয় হস্তদ্বয়ে পুস্তক ও তরবারি এবং চতুর্থ হস্তদ্বয়ে ঘণ্টা ও বজ্র ধারণ করেন। তাঁহার মুকুটোপরি একটি ক্ষুদ্র অমিতাভ-মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়।

মঞ্জুঘোষ॥ এই মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী একমুখ ও দ্বিভুজ। ইনি সর্বালংকার ভূষিত। একটি সিংহের উপর উপবিষ্ট থাকেন এবং হস্তদ্বয়ে ব্যাখ্যান বা ধর্মচক্রমুদ্রা প্রদর্শন করেন। বাম পার্শ্বে একটি উৎপল থাকে। ইঁহার দক্ষিণে সুধনকুমার এবং বামে যমান্তক দাঁড়াইয়া থাকেন।

সিদ্ধৈকবীর॥ এই মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী একমুখ ও দ্বিভুজ এবং দিব্য অলংকারে সুশোভিত। তাঁহার গায়ের রং সাদা। তিনি বজ্র পর্যঙ্ক বা ধ্যানাসনে বসিয়া থাকেন। বামহস্তে নীল উৎপল এবং দক্ষিণে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন। তাঁহার মুকুটোপরি একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য মূর্তি বিরাজ করে।

বজ্রানঙ্গ॥ এই মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী একমুখ এবং ষড়্‌ভুজ। তাঁহার রং হলদে এবং তিনি ষোড়শবর্ষাকৃতি। তিনি প্রত্যালীঢ় পদে দণ্ডায়মান থাকেন এবং তাঁহার মুখে ও ভাবে শৃঙ্গাররস প্রকটিত হয়। মুখ্য ভুজদ্বয় তিনি ফুলের ধনুতে লালপদ্মের বাণ জুড়িয়া আকর্ণ আকর্ষণ করেন, অপর দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে অসি এবং দর্পণ ও অপর বাম ভুজদ্বয়ে পদ্ম এবং অশোক পল্লব ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার জটামুকুটের উপর একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য মূর্তি পরিদৃশ্যমান হয়।

নামসংগীতিমঞ্জুশ্রী॥ এই মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী ত্রিমুখ ও চতুর্ভুজ। ইঁহার অঙ্গের বর্ণ রক্তমিশ্রিত গৌর এবং ইনি বজ্রপর্যঙ্ক বা ধ্যানাসনে উপবিষ্ট থাকেন। ইহার প্রথম মুখটি লাল, দক্ষিণ মুখ নীল এবং বাম মুখ শুক্ল। ইঁহার চারিটি হস্তে যথাযোগে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক, খড়্গ, ধনু এবং বাণ থাকে। ইনি কুমাররূপী এবং রাজকুমারের যোগ্য বস্ত্র এবং আভরণে ভূষিত থাকেন। ইঁহার মুকুটের উপর একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য মূর্তি দেখা যায়।

বাগীশ্বর॥ এই মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী কুমারাকৃতি, কুঙ্কুমারুণ বর্ণ, সর্বালংকার ভূষিত, একমুখ ও দ্বিভুজ। ইনি সিংহের উপর ললিতাসনে এক পা লম্বিত করিয়া উপবেশন করেন। ইনি বামে উৎপল ধারণ করেন এবং ইঁহার দক্ষিণ হস্ত সাবলীলভাবে রক্ষিত থাকে।

মঞ্জুবর॥ এই মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ কুমারাকৃতি সর্বালংকারে

ভূষিত, একমুখ ও দ্বিভুজ। ইনি সিংহের উপর ললিতাসনে বসিয়া থাকেন এবং হস্তদ্বয়ে বক্ষের নিকট ধর্মচক্রমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বামপার্শ্ব হইতে উত্থিত উৎপলের উপর প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক রক্ষিত থাকে।

মঞ্জুবজ্র ॥ এই মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী কুঙ্কুমারুণ বর্ণ, কুমারাকৃতি, সর্বালংকার ভূষিত, ত্রিমুখ এবং ষড়্ভুজ। ইঁহার প্রধান মুখ লাল, দক্ষিণ নীল এবং বাম শ্বেত। ইনি ইঁহার স্বকীয় আভা হইতে উৎপন্ন শক্তির সহিত আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ থাকেন। একটি হাতে শক্তির চিবুক স্পর্শ করেন এবং অপর হাতে আলিঙ্গন করেন। বাকি চারিটি হাতে যথাযোগে খড়্গ, বাণ, ধনু এবং নীল উৎপল রক্ষিত হয়।

মঞ্জুকুমার ॥ এই মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী কুঙ্কুমারুণ বর্ণ, অনুরাগশীল, কুমারাকৃতি এবং রাজোচিত বেশভূষায় শোভিত। ইনি ত্রিমুখ এবং ষড়্ভুজ, মনুষ্য-দেহোপরি উপবিষ্ট। ইঁহার প্রধান মুখ লাল, দক্ষিণ নীল এবং বাম শ্বেত বর্ণের। দক্ষিণ করত্রয়ে খড়্গ, বাণ ও বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বাম করত্রয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক, নীল উৎপল এবং ধনু রক্ষিত হয়।

অরপচন ॥ মঞ্জুশ্রীর অরপচন নাম কেন হইল তাহা জানিতে হইলে তাঁহার মূর্তি ও মন্ত্র জানা দরকার। এই মঞ্জুশ্রীর মন্ত্র 'ওঁ অরপচনধীঃ'। উক্ত মন্ত্র হইতেই অরপচন নামকরণ হইয়াছে। মঞ্জুশ্রীর এই মূর্তির সঙ্গে আরও চারটি দেবতা থাকে। মঞ্জুশ্রী নিজে অ-কারাক্ষর হইতে উৎপন্ন হন, অপর চারিটি দেবতা র-কার, প-কার, চ-কার এবং ন-কার অক্ষর হইতে উৎপন্ন হন বলিয়া চতুর্দেবতা সহ মঞ্জুশ্রীর এই মূর্তিকে অরপচন নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

ধ্যান হইতে বুঝা যায় অরপচন মঞ্জুশ্রী শৃঙ্গার রসাভিনয়ী, কুমারাকৃতি, স্মিত বিকশিত বদন, শশাঙ্ক-কান্তি, সর্বালংকার ভূষিত, একমুখ এবং

দ্বিভুজ। ইনি ধ্যানাসনে উৎপলোপরি সমাসীন এবং দক্ষিণ হস্তে উদ্যত খড়্গ এবং বাম হস্তে বক্ষের নিকট পুস্তক ধারণ করিয়া থাকেন। মঞ্জুশ্রীর সম্মুখে থাকেন জালিনীকুমার এবং পশ্চাতে চন্দ্রপ্রভ, দক্ষিণে কেশিনী ও বামে উপকেশিনী উপবিষ্ট থাকেন। সকলেরই বর্ণভুজাদি মুখ্য দেবতা অরপচনের ন্যায় হইয়া থাকে।

স্থিরচক্র॥ সাধনমালার একটি সাধনা হইতে জানা যায় যে স্থিরচক্র মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী একমুখ, দ্বিভুজ, শ্বেতবর্ণ এবং কৃষ্ণ পরিচ্ছদে বিভূষিত। তিনি পদ্মোপরি উপবিষ্ট। তিনি দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ধারণ করেন এবং বাম হস্তে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন। তাঁহার সহিত শক্তি থাকে।

বাদিরাট্॥ এই মূর্তিতে মঞ্জুশ্রী ষোড়শবর্ষাকার, শার্দূলপৃষ্ঠে সমাসীন, সৌন্দর্যরাশির আশ্রয় স্বরূপ, রাজোচিত বেশভূষা এবং মণি-রত্নাদি নানা অলংকারে সুশোভিত। অর্ধপর্যঙ্কে বামপদ আসনের উপর উচ্চ করিয়া বসিয়া থাকেন এবং দুইটি হাতে ব্যাখ্যান অথবা ধর্মচক্রমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর

পূর্বেই বলা হইয়াছে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের স্থান বৌদ্ধ দেবসংঘে অতি উচ্চ। মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের মধ্যে কে যে বড়ো আর কে যে ছোটো তাহা বুঝিবার উপায় নাই। অবলোকিতেশ্বর অমিতাভ ও পাণ্ডরা হইতে উৎপন্ন, ইঁহাদের কুলের নাম পদ্মকুল এবং ইঁহাদের প্রতীকচিহ্ন পদ্ম। যে কল্প এখন চলিতেছে তাহাকে বলে ভদ্রকল্প। এই কল্পের অবলোকিতেশ্বরই হর্তাকর্তা বিধাতা। ইনিই সৃষ্টির এখন রক্ষাকর্তা। শাক্যসিংহের নির্বাণের পর হইতে যতদিন না ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয় আসেন ততদিন সৃষ্টিরক্ষার জন্য ধর্মপ্রচার-কার্য উপদেশ ইত্যাদি অবলোকিতেশ্বরই করিবেন।

অবলোকিতেশ্বর করুণার অবতার, মহাকারুণিক। কথিত আছে, তিনি জগতের দুঃখ দেখিয়া এতই অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি নিজের মোক্ষ বা নির্বাণ যোগ্যভাবে অর্জন করা সত্ত্বেও তাহা পরিত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতদিন পৃথিবীতে একটি প্রাণীও দুঃখে অভিভূত থাকিবে ততদিন তিনি নির্বাণ লাভ করিবেন না। যতদিন না সকল প্রাণী সর্বপ্রকার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অনুত্তর সম্যক সম্বোধিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে, ততদিন তিনি বিশ্রাম করিবেন না। তাহার জন্য তিনি সদাসর্বদা প্রাণীদিগকে উপদেশ দিয়া যাইবেন। তিনি যে জীব যেভাবে যাহাকে পূজা করে, তিনি সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া উপদেশ দিয়া যাইবেন। যাহারা তথাগতকে মানে তিনি তথাগতরূপে তাহাদের ধর্মদেশনা করিবেন। যাহারা মহেশ্বরের উপাসক তিনি

মহেশ্বররূপে তাহাদের ধর্মদেশনা করিবেন। যাহারা বিষ্ণু বায়ু ইত্যাদির উপাসনা করে অবলোকিতেশ্বর সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের ধর্মদেশনা করিবেন। যাহারা রাজার উপাসক তাহাদিগকে রাজরূপে ধর্মোপদেশ করিবেন। এমন কি যাহারা পিতা বা মাতাকে মানে তাহাদিগকে মাতৃপিতৃরূপ ধারণ করিয়া ধর্মোপদেশ করিয়া যাইবেন। এইরূপ ধর্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে তাহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া অবশেষে মোক্ষমার্গে উপস্থিত হইবে। এইরূপে সর্বসত্ত্ব যখন মোক্ষলাভ করিবে তখন অবলোকিতেশ্বরের কার্য শেষ হইবে এবং তখনই তিনি স্বেচ্ছায় মোক্ষলাভ করিবেন।

অবলোকিতেশ্বরের এই আদর্শই মহাযানের সর্বাপেক্ষা বড়ো আদর্শ। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মোক্ষের অধিকারী হওয়া যায় একথা তাঁহারা যেমন বুঝাইয়াছিলেন এমনটি আর কেহ করে নাই। অবলোকিতেশ্বরের জীবনচরিত্র কারণ্ডব্যূহ নামক মহাযানসূত্রে দেওয়া আছে। অবলোকিতেশ্বরের মহাকরুণা মহাযানের একটি মূল তত্ত্ব। প্রত্যেক বৌদ্ধমার্গীর করুণার উদয় হওয়া চাই। যদি করুণা না থাকে তাহা হইলে সে বৌদ্ধ নামে অভিহিত হইতে পারে না। বৌদ্ধদর্শনে বলে, মোক্ষের পথে দুইটি অচ্ছেদ্য আবরণ থাকে— একটির নাম ক্লেশাবরণ এবং অপরটির নাম জ্ঞেয়াবরণ। শূন্যতার উপলব্ধি হইলে ক্লেশের আবরণটি অপসারিত হয়। কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া পরার্থে তৎপর না হইলে জ্ঞেয়াবরণকে ছিন্ন করা অসম্ভব।

এই দিব্য ত্যাগের বাণী অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে এখন পর্যন্ত অনেক ধর্মপ্রচারকের মুখে এই বাণী শুনা যায়। তাঁহারা বলেন, আমরা বার বার মানবের কল্যাণের

জন্য জন্মপরিগ্রহণ করিব। মানবকল্যাণই আমাদের কাম্য, মোক্ষ আমাদের কাম্যবস্তু নহে। যখনই তাঁহারা এইরূপ প্রচার করেন তখনই বুঝিতে হইবে তাঁহারা অবলোকিতেশ্বরের কথার প্রতিধ্বনি করিতেছেন।

সাধনমালা, নিষ্পন্নযোগাবলী এবং অপরাপর বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থে অবলোকিতেশ্বরের নানাপ্রকারের রূপ কল্পিত হইয়াছিল। নেপালের মছন্দর বাহালের প্রাচীরগাত্রে অবলোকিতেশ্বরের ১০৮ প্রকারের মূর্তি চিত্রিত আছে। অবলোকিতেশ্বরের সমস্ত রূপ বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থের সাধ্যাতীত। তাই অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় রূপেরই বর্ণনা এখানে দেওয়া হইবে। অবলোকিতেশ্বরের নানাবিধ মূর্তি ভারতের নানাস্থানে, নেপালে, তিব্বতে, চিনে, জাপানে, মাঞ্চুরিয়া ইত্যাদি দেশে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত রূপবর্ণনা হইতে সেসকল মূর্তির পরিচয় হইতে পারে। শিল্পীরা যাহার উপর ভিত্তি করিয়া মূর্তি নির্মাণ করিতেন, সেইগুলিকে ধ্যান বলে এবং দেবতাকে মানসচক্ষে সমাধির সময় দর্শন করিবার পর সেই ধ্যান লিপিবদ্ধ করিয়া জগতে প্রচার করা হইয়াছিল।

অবলোকিতেশ্বরের অদ্যাবধি যতগুলি ধ্যান পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত রূপগুলি দৃষ্ট হয়। একে একে সেই রূপগুলির বিবরণ এই স্থানে দেওয়া হইল। বলাবাহুল্য, সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় রূপগুলিরই এখানে উল্লেখ করা সম্ভব।

ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর ॥ অবলোকিতেশ্বরকে সময়ে সময়ে ষড়ক্ষরী নামে অভিহিত করা হয়, কারণ তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মন্ত্রে মাত্র ছয়টি অক্ষর আছে। এই মন্ত্রটি তিব্বতীয়দের কল্যাণে আজও জগতে সুপরিচিত। মন্ত্রটি 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ', ষড়ক্ষর বিশিষ্ট। এই মন্ত্র একটি সিদ্ধ মন্ত্র, অর্থাৎ একলক্ষ বার অনন্য মনে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় জপ করিলে দেবতার

দর্শন হয় এবং সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্র জপ করিতে করিতে যে অবলোকিতেশ্বরের দর্শন হয়, তাহা একমুখ, চতুর্ভুজ, শুক্ল বর্ণ ও সর্বালংকার-ভূষিত। তাঁহার প্রধান ভুজদ্বয় অঞ্জলি-মুদ্রায় বদ্ধ হইয়া হৃৎপ্রদেশে রক্ষিত হয়, এবং অপর দুইটি হাতের দক্ষিণটিতে অক্ষসূত্র বা রুদ্রাক্ষের মালা এবং বামটিতে পদ্মের উপর একখানি পুস্তক থাকে। মূল দেবতার দক্ষিণে থাকেন মণিধর এবং বামে থাকেন ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা। এই পার্শ্বদেবতাদ্বয় দেখিতে ঠিক মূল দেবতার ন্যায় একমুখ ও চতুর্ভুজ। তাঁহারা প্রথম হস্তদ্বয়ে হৃৎপ্রদেশে অঞ্জলি-মুদ্রা এবং অপর হস্তদ্বয়ে অক্ষসূত্র ও পুস্তক ধারণ করিয়া থাকেন। তিন জনই এক-একটি পৃথক পদ্মের উপর উপবেশন করিয়া থাকেন।

সিংহনাদ ॥ সিংহনাদ লোকেশ্বরের মন্ত্র বিশেষ শক্তিশালী। এই মন্ত্রটি অসুখ-বিসুখ সারাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। গোময়ের উপর কয়েকবার মন্ত্র জপ করিয়া কোনো ব্যাধির উপর লেপন করিলে ব্যাধি সারিয়া যাইত। মন্ত্রভৈষজ্যে সিংহনাদের মন্ত্র বিশেষ কার্যকরী হইত বলিয়া তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

সিংহনাদের ভেষজ মন্ত্রটিকে সিংহনাদধারণী বলা হইত। মন্ত্রপদগুলি এইরূপ : 'নম আর্যাবলোকিতেশ্বরায় বোধিসত্ত্বায় মহাসত্ত্বায় মহাকারুণিকায। তদ্যথা ওঁ অকটে বিকটে নিকটে কটংকটে করোটে করোট বীর্যে স্বাহা।'

মূর্তি কল্পিত হইলে সিংহনাদের বর্ণ শ্বেত হয়। তিনি ত্রিনেত্র, জটামুকুটধারী, নির্ভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত, সিংহের উপর মহারাজলীলায় উপবিষ্ট হন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সাদা সর্প বেষ্টিত একটি সাদা ত্রিশূল দেখা যায় এবং বামে নানা সুগন্ধ পুষ্প পরিপূরিত পদ্মের ভাণ্ড থাকে। সিংহনাদের বাম হস্ত হইতে উত্থিত পদ্মের উপর দীপ্তিশালী একটি খড়্গ

শোভা পায়।

পাথরের এইরূপ মূর্তি দেখিতে সত্যই মনোহর।

খসর্পণ।। খসর্পণ লোকেশ্বরের বর্ণ শ্বেত। তিনি একমুখ ও দ্বিভুজ। তিনি ললিতাসনে পদ্মের উপর বসিয়া থাকেন। দক্ষিণে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বাম করে সনাল কমল ধারণ করেন। দক্ষিণ হস্ত হইতে নিঃসৃত পীযূষধারা সূচিমুখ পান করেন। এই সূচিমুখ ঊর্ধ্বমুখ, বৃহদুদর, অতিকৃশদেহ এবং প্রেতের ন্যায় ফ্যাকাশে।

খসর্পণের সম্মুখে থাকেন তারা এবং দক্ষিণে সুধনকুমার। তারা শ্যামবর্ণা, বাম করে সনাল পদ্ম ধারণ করেন এবং পদ্মটি দক্ষিণ করে প্রস্ফুটিত করেন। সুধনকুমার কনকবর্ণ, হস্তদ্বয়ে অঞ্জলি ধারণ করেন এবং তাঁহার বাম কক্ষপুটে পুস্তক থাকে।

খসর্পণের পশ্চাতে থাকেন ভৃকুটী এবং উত্তরে হয়গ্রীব। এস্থলে ভৃকুটী চতুর্ভুজা, সুবর্ণবর্ণা, দক্ষিণে একটি হাতে বন্দনা অভিনয় করেন ও অপরটিতে অক্ষসূত্র ধারণ করেন। বামের দুইটি হস্তে ত্রিদণ্ডী ও কমণ্ডলু ধারণ করেন।

হয়গ্রীব রক্তবর্ণ, খর্ব, লম্বোদর, সর্পনির্মিত যজ্ঞোপবীতধারী, ভ্রুকুটিকুটিল মুখবিশিষ্ট এবং দংষ্ট্রাকরালবদন। তাঁহার বাম হস্তে দণ্ড থাকে এবং তিনি দক্ষিণ কর উচ্চ করিয়া বন্দন অভিনয় করেন।

তারা, সুধনকুমার, ভৃকুটী ও হয়গ্রীবকে দেখিয়া খসর্পণ-মূর্তি চিনিতে হয়। খসর্পণের মূর্তি খুব বেশি পাওয়া না গেলেও, নিতান্ত বিরল নহে। ভারতে ও নেপালে এই মূর্তির প্রচলন আছে।

লোকনাথ ।। অবলোকিতেশ্বরের লোকনাথ-মূর্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্তি নিতান্ত সাদাসিধা। ইনি শ্বেতবর্ণ, দক্ষিণে বরদহস্ত

এবং বামে উৎপল ধারণ করেন। মুকুটোপরি একটি ক্ষুদ্র অমিতাভ-মূর্তি ধারণ করেন। কখনও কখনও ইঁহার সহিত আটটি অন্যান্য বোধিসত্ত্বকে দেখা যায়। তাহাদের নাম মৈত্রেয়, ক্ষিতিগর্ভ, বজ্রপাণি, খগর্ভ, বিষ্কম্ভি, সমন্তভদ্র, মঞ্জুঘোষ এবং গগনগঞ্জ। লোকনাথের পরিবারের মধ্যে আরও চারিটি দেবী থাকেন। তাঁহাদের নাম ধূপা, পুষ্পা, গন্ধা ও দীপা। চারিটি দ্বারে চারটি দ্বার-পালিকাকেও দেখা যায়। তাহাদের নাম: বজ্রাঙ্কুশী, বজ্রপাশী, বজ্রস্ফোটা ও বজ্রঘণ্টা। যথাক্রমে ইহাদের হাতে অঙ্কুশ, পাশ, শৃঙ্খল ও ঘন্টা থাকে।

হালাহল॥ হালাহল-মূর্তিতে অবলোকিতেশ্বর শ্বেতবর্ণ, ত্রিমুখ, ষড়্‌ভূজ ও শক্তিসহিত পরিকল্পিত হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রথমাস্য শ্বেত, দক্ষিণাস্য নীল এবং বামাস্য লোহিত বর্ণের। প্রথম দক্ষিণভুজে বরদমুদ্রা,দ্বিতীয়ে অক্ষমালা এবং তৃতীয়ে শর ধারণ করেন। বাম প্রথম ভুজে ধনু, দ্বিতীয়ে শ্বেতপদ্ম এবং তৃতীয়ে শক্তিকে স্পর্শ করিয়া থাকেন। তিনি লালিতাসনে রক্তপদ্মের উপর উপবেশন করেন।

পদ্মনর্তেশ্বর ॥ অবলোকিতেশ্বরের এই মূর্তি অতিশয় চিত্তাকর্ষক ও একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। ইহার মুখ একটি এবং হাত আঠারোটি। প্রত্যেকটি হাতে একটি বিশ্বপদ্ম বা জোড়াপদ্ম থাকে। ইনি অর্ধপর্যঙ্কে নৃত্য করিতে থাকেন। অর্থাৎ এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং অপর পায়ের চেটো সেই পায়ের উরুতে সংলগ্ন থাকে। ইহাকে অর্ধপর্যঙ্ক-নৃত্যাসন বলা হয়।

ইহা ছাড়াও পদ্মনর্তেশ্বরের আরও দুইটি রূপ আছে। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে সেগুলি দেওয়া হইল না।

হরিহরিহরিবাহনোদ্ভব॥ অবলোকিতেশ্বরের এই মূর্তিটির নামও যেমন অদ্ভুত, কল্পনাও তেমনি অদ্ভুত। তিনটি হরি রূপ বাহন হইতে যাঁহার

উদ্ভব তিনিই হরি হরি হরি বাহনোদ্ভব। সংস্কৃতে হরি মানে সিংহ হয়, গরুড় হয় ও বিষ্ণু হয়। যে অবলোকিতেশ্বরের নিম্নতম বাহন সিংহ, সিংহের উপরে গরুড় ও গরুড়ের উপর বিষ্ণু বাহনরূপে বিরাজ করে তাঁহাকেই হরি হরি হরি বাহন লোকেশ্বররূপে অভিহিত করা হয়। এই লোকেশ্বরের বর্ণ সাদা, মুখ একটি এবং হাত ছয়টি। দক্ষিণ প্রথম করে সাক্ষীমুদ্রা অর্থাৎ এই কর দিয়া তিনি শূন্য ভগবানকে সাক্ষী করেন, দ্বিতীয় করে অক্ষমালা ধারণ করেন এবং তৃতীয় করে লোকদের উপদেশ করেন। বামে প্রথম করে দণ্ড, দ্বিতীয় করে কৃষ্ণাজিন এবং তৃতীয়ে কমণ্ডলু ধারণ করেন।

এইরূপ অদ্ভুত মূর্তি প্রস্তরে এবং ধাতুতে কেবল নেপালেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্রৈলোক্যবশঙ্কর।। অবলোকিতেশ্বরের এই মূর্তিকে উড্ডিয়ান লোকেশ্বর নামেও অভিহিত করা হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে উড্ডিয়ান একটি বড়ো তান্ত্রিকদের পীঠ ছিল এবং খুব সম্ভব উহাই এখানকার বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রাম। উড্ডিয়ানের তান্ত্রিক যোগীরা এই দেবতার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাধনার প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই খুব সম্ভব এই মূর্তিকে উড্ডিয়ান লোকেশ্বর আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল।

ইঁহার বর্ণ লাল এবং ইনি একমুখ এবং দ্বিভুজ। ইনি পদ্মের উপর বজ্রপর্যঙ্কাসনে অথবা ধ্যানাসনে বসিয়া থাকেন। দুইটি হাতে বজ্রাঙ্কিত পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করেন।

রক্ত লোকেশ্বর।। অবলোকিতেশ্বরের এই মূর্তি রক্ত বর্ণ। ইনি রক্তকুসুমায়িত আশোকবৃক্ষের তলায় অবস্থান করেন। ইঁহার মুখ একটি এবং হাত চারিটি। চারিটি হাতে পাশ, অঙ্কুশ, ধনু ও বাণ ধারণ করেন

এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে তারা ও ভৃকুটী পরিবার দেবতারূপে অবস্থান করেন। ইঁহার দুইহস্ত-বিশিষ্ট আর-একটি রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি হাতে তিনি পদ্মের কুঁড়ি ধরিয়া অপর হস্তে তাহাই বিকশিত করেন।

মায়াজালক্রম॥ বজ্রযানীদিগের মায়াজালতন্ত্র নামে একখানি তন্ত্রের পুথি আছে। এই তন্ত্রে বর্ণিত অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিকেই মায়াজালক্রম নামে অভিহিত করা হয়। অবলোকিতেশ্বরের এই মূর্তিটি একটু ভীষণ প্রকৃতির। মূর্তি কৃষ্ণবর্ণ, পঞ্চমুখ এবং দ্বাদশভুজ। মুখ দংস্ট্রাকরাল, শরীর মুণ্ডমালালংকৃত এবং অস্থ্যলংকারে শোভিত। প্রথম মুখ কৃষ্ণ, দুইটি দক্ষিণমুখ সিত ও রক্ত এবং দুইটি বামমুখ পীত ও হরিত। ছয়টি দক্ষিণভুজে ডমরু, খট্টাঙ্গ, অঙ্কুশ, পাশ, বজ্র ও শর ধারণ করেন এবং ছয়টি বামকরে তর্জনী, কপাল, রক্তকমল, মণি, চক্র ও চাপ ধারণ করেন।

নীলকণ্ঠ ॥ নীলকণ্ঠ-মূর্তিতে অবলোকিতেশ্বরের একমুখ। তিনি দ্বিভুজ, নিরলংকার এবং ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার হাত দুইটি, একটির উপর একটি ক্রোড়ের উপর সমাধিমুদ্রায় বিন্যস্ত হইয়া থাকে। হাতের উপর নানারত্ন পরিপূর্ণ একটি কপাল থাকে। দুইটি ফণাধর সর্প পরস্পরের পুচ্ছ জড়াইয়া দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। দেবতার কণ্ঠে নীলবর্ণ বিষগুটিকা থাকে। এই মূর্তিতে অবলোকিতেশ্বর হিন্দু দেবতা মহাদেবের সমরূপ।

সুগতি সন্দর্শন ॥ এই মূর্তি শ্বেতবর্ণ একমুখ এবং ষড়্‌ভুজ। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে বরদমুদ্রা, অভয়মুদ্রা এবং অক্ষমালা ধারণ করেন। বাম হস্তত্রয়ে পদ্ম, কুণ্ডী ও ত্রিদণ্ডী ধারণ করেন।

প্রেতসন্তর্পিত ॥ এই মূর্তিতে অবলোকিতেশ্বর শ্বেত বর্ণ বিশিষ্ট, একমুখ, ষড়্‌ভুজ এবং চন্দ্রাসনের উপর দাঁড়াইয়া থাকেন। প্রথম বা মুখ্য ভুজদ্বয়ে দুইটি বরদমুদ্রা, দ্বিতীয় ভুজদ্বয়ে রত্ন এবং পুস্তক। এবং তৃতীয়

ভুজদ্বয়ে অক্ষমালা ও ত্রিদণ্ডী ধারণ করিয়া থাকেন।

সুখাবতী॥ এই মূর্তিতে অবলোকিতেশ্বর শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট, ত্রিমুখ ও ষড়্ভুজ। ইনি পদ্মাসনোপরি ললিতাসনে উপবিষ্ট এবং ইঁহার সহিত শক্তি একাসনে বসিয়া থাকেন। তিনটি দক্ষিণ হস্তে বাণ, অক্ষমালা এবং বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দুইটি বামহস্ত দ্বারা ধনু ও পদ্ম ধারণ করেন এবং তৃতীয়টি শক্তিরূপী তারাদেবীর উরুতে ন্যস্ত থাকে। মূল দেবতাকে বজ্রতারা, বিশ্বতারা, পদ্মতারা প্রমুখ দেবীরা ঘিরিয়া রাখেন।

বজ্রধর্ম॥ এই মূর্তিতে অবলোকিতেশ্বর একমুখ, দ্বিভুজ এবং রক্তমিশ্রিত গৌরবর্ণ বিশিষ্ট। ইনি ময়ূরের উপর বসিয়া থাকেন। ইঁহার একটি হাতে পদ্মের কুঁড়ি থাকে এবং সেইটি বক্ষের নিকট দক্ষিণ হস্ত দিয়া প্রস্ফুটিত করেন। এইরূপে বজ্রধর্মের ধ্যান করিতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

অমিতাভকুল

পূর্বেই বলা হইয়াছে অমিতাভকুলের প্রবর্তক ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ। অমিতাভ যে নিঃস্বভাব জগৎকারণ শূন্যেরই একটি গুণ তাহা তাঁহার নাম হইতেই প্রকাশ পায়। অমিতাভের অর্থ অমিত বা অপরিমিত আভা অর্থাৎ দীপ্তি যাহার আছে তাহাকেই অমিতাভ বলা হয়। ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের বুদ্ধশক্তি পাণ্ডরা বা পাণ্ডরবাসিনী। ইঁহাদের কুলের নাম পদ্মকুল এবং পদ্মই এই কুলের প্রতীকচিহ্ন। সাধারণত অমিতাভকুলের সমস্ত দেবদেবীর বর্ণ রক্ত বা লাল, যদিও এবিষয়ে বাঁধাধরা নিয়মের যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। অমিতাভ পঞ্চস্কন্ধের সংজ্ঞা নামক স্কন্ধের অধিপতি। ইনি সমস্ত পশ্চিম দিকের উপর আধিপত্য করেন এবং মণ্ডলের যত দেবতা পশ্চিম দিকে থাকেন তাঁহারা সকলেই অমিতাভকুলের অন্তর্বর্তী। অমিতাভ গ্রীষ্মঋতুর দেবতা, অম্লরস ইঁহার প্রধান রস এবং অক্ষর-বর্গের টবর্গ অমিতাভ হইতেই উৎপন্ন হয়। গুহ্যসামজে দেখা যায় অমিতাভ 'আরোলিক্' মন্ত্রপদ হইতে উৎপন্ন হন এবং পাণ্ডরবাসিনী 'রাগরতি', মন্ত্রাক্ষর হইতে ঘনীভূত হইয়া দেবতাকারে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এই অমিতাভকুলের আর-একটি নাম রাগকুল। রাগ বা অনুরাগের বর্ণ রক্ত বা লাল কল্পনা করা হয় বলিয়া এই কুলের বর্ণ লাল।

অমিতাভকুলের প্রধান ও মহান শক্তিশালী দেবতা অবলোকিতেশ্বর বা লোকেশ্বর। ইহার ১০৮ প্রকার মূর্তি কল্পিত হইয়াছিল এবং ১০৮ প্রকারের প্রাচীরচিত্র এখনও দেখা যায়। ইহার অসংখ্য মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল এবং সাধনাও অনেক আছে। অবলোকিতেশ্বরের সম্বন্ধে এত

বেশি মাল-মসলা পাওয়া যায় যে তাঁহার জন্য অনায়াসে একখান পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করা যায়। ইঁহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

অবলোকিতেশ্বর ছাড়াও অমিতাভের সন্ততি আছে। তাহাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি পুরুষদেবতা এবং কয়েকটি স্ত্রীদেবতা। সকলেই অমিতাভের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি মস্তকোপরি ধারণ করেন।

মহাবল॥ অমিতাভ কুলের একজন পুরুষদেবতা। ইঁহার বর্ণ লাল এবং ইনি একমুখ এবং চতুর্ভুজ। ইনি ভীষণাকৃতি, ইঁহার বদন দংস্ট্রাকরাল, অগ্নিশিখার ন্যায় পিঙ্গালবর্ণের কেশরাজি ঊর্ধ্বে উত্থিত। ইঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম এবং ইনি সর্পাভরণে ভূষিত। ইনি প্রত্যালীঢ় পদে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং ইঁহার দুইটি দক্ষিণভুজে সাদা দণ্ড এবং চামর থাকে। বাম দিকে একটি ভুজ বন্দনার অভিনয়ে ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় এবং দ্বিতীয়টিতে তর্জনী প্রদর্শন করেন। মহাবল মণ্ডলের পশ্চিম প্রদেশের দ্বারপালক রূপে গণ্য হইয়া থাকেন।

সপ্তশতিক হয়গ্রীব॥ অমিতাভকুলের এই দেবতাও মহাবলের ন্যায় দেখিতে ভীষণাকৃতি। ইঁহার দংস্ট্রাকরাল বদন, সর্পের আভরণ, অগ্নিজ্বালা সদৃশ কেশরাজি, ব্যাঘ্রচর্মের পরিধান, খর্ব, লম্বোদর রূপ বিশেষরূপে সুরাসুরগণের ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রহরণ স্বরূপ তাঁহার হাতে বজ্রাঙ্কিত দণ্ড থাকে। তাঁহার মূর্তির বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার মস্তকের একপার্শ্বে একটি ঘোড়ার মুখ দেখা যায়। এই ঘোড়ার মুখ দেখিয়াই হয়গ্রীবের মূর্তি চিনিতে হয়।

কুরুকুল্লা॥ অমিতাভের স্ত্রী-সন্ততিদের মধ্যে কুরুকুল্লার নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি এককালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন এবং ইঁহার

মূর্ত নেপাল তিব্বতে এমন কি মাঞ্চুরিয়ায় পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। সাধনমালায় অনেকগুলি কুরুকুল্লার সাধনা পাওয়া যায় এবং তাঁহার রূপও অনেক প্রকারের কল্পিত হইয়াছিল। যখন তাঁহার দুইটি হাত থাকে, তখন তাঁহার নাম হয় শুক্ল কুরুকুল্লা। যখন তিনি চতুর্ভুজা হন তখন তাঁহার নাম হয় তারোদ্ভব কুরুকুল্লা , উড্ডিয়ান কুরুকুল্লা, হেবজ্রক্রম কুরুকুল্লা এবং কল্পোক্ত কুরুকুল্লা। কুরুকুল্লার একটি অষ্টভুজ রূপও আছে। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে একটি মাত্র কুরুকুল্লার রূপ এখানে দেওয়া হইল।

উড্ডিয়ানে যে কুরুকুল্লা কল্পিত হইয়াছিলেন বা সেখানে পূজিত হইতেন, তাঁহার নাম স্থান-মাহাত্ম্যে উড্ডিয়ান কুরুকুল্লা নামে পরিচিত হইয়াছিল। ইহাতে দেবী চতুর্ভুজা এবং ভীষণাকৃতি। তাঁহার বিকরাল বদন, মুণ্ডমালা, ললজ্জিহ্বা, জ্বলৎপিঙ্গলকেশরাজি, ব্যাঘ্রচর্মের বসন, সর্পের ভূষণ ইত্যাদি দর্শকের মনে মহাভীতির সঞ্চার করে। প্রধান হস্তদ্বয়ে তিনি পুষ্পনির্মিত ধনুতে পুষ্পের বাণ যোজনা করিয়া আকর্ণ আকর্ষণ করেন। দ্বিতীয় হস্তদ্বয়ে পুষ্পনির্মিত অঙ্কুশ এবং রক্তপদ্ম ধারণ করেন। কুরুকুল্লার মন্ত্র তান্ত্রিক ষট্‌কর্মে আকর্ষণ বশীকরণাদি কার্যে ব্যবহৃত হইত।

ভৃকুটী ॥ অমিতাভকুলের এই দেবীর গায়ের রং হলদে এবং ইনি একমুখী ও চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরদমুদ্রা ও অক্ষসূত্র প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার বামহস্তদ্বয়ে ত্রিদণ্ডী ও কমণ্ডলু থাকে। তাঁহার মাথার উপর অমিতাভের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি পদ্মচন্দ্রাসনে বসিয়া থাকেন।

মহাসিতবতী ॥ পাঁচটি দেবীকে লইয়া পঞ্চরক্ষা মণ্ডল গঠিত হয়। মহাসিতবতী এই পঞ্চরক্ষা দেবীর অন্যতম। ইনি অমিতাভকুলের অন্তর্গত এবং মুকুটোপরি অমিতাভের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি ধারণ করেন। ইঁহার গায়ের

রং লাল এবং ইনি অর্ধপর্যঙ্কাসনে বসিয়া থাকেন। ইঁহার মুখ একটি এবং হাত চারিটি। দুইটি দক্ষিণ হস্তের একটিতে অক্ষসূত্র ধারণ করেন এবং অপরটিতে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন। বামহস্তের একটিতে বজ্রাঙ্কিত অঙ্কুশ এবং অপরটিতে হৃৎপ্রদেশে পুস্তক ধারণ করেন। মহাসিতবতীর চর্চা ভবিষ্যতে পঞ্চরক্ষা-মণ্ডলের বিবরণে আবার করা হইবে।

অক্ষোভ্যকুলের দেবগণ

অক্ষোভ্যকুলের প্রবর্তক ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য। অক্ষোভ্যও যে অন্যান্য ধ্যানীবুদ্ধের ন্যায় স্বভাবশুদ্ধ, নিঃস্বভাব, জগৎকারণ, শূন্যেরই রূপান্তর তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। অক্ষোভ্য শব্দের অর্থ যাহার ক্ষোভ নাই, যিনি অচল এবং সকল অবস্থাতেই চঞ্চলতা রহিত। এইটি শূন্যের একটি গুণ এবং এই গুণেরই মূর্তস্বরূপ হইলেন অক্ষোভ্য ধ্যানীবুদ্ধ। ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের শক্তি মামকী। ইঁহাদের কুলের নাম বজ্রকুল এবং বজ্রই এই কুলের কুলচিহ্ন। সাধারণত অক্ষোভ্যকুলের সকল দেবদেবীরই বর্ণ নীল এবং তাঁহারা সকলেই ভীষণাকৃতি ও ভীতিপ্রদ, যদিও কখনও কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অক্ষোভ্য পঞ্চস্কন্ধের ভিতর বিজ্ঞানস্কন্ধের অধিপতি। ইনি পূর্বদিশার উপর আধিপত্য করেন এবং পূর্বদিশাস্থ সকল দেবতাই তাঁহার কুলের অন্তর্গত। ইনি শিশির-ঋতুর মালিক, ইঁহার স্বাদ কটু অর্থাৎ সকল কটুরসাত্মক দ্রব্যই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং অক্ষরমালার চ-বর্গ তাঁহার অক্ষরবর্গ বলিয়া পরিগণিত। গুহ্যসমাজে দেখা যায় অক্ষোভ্য 'বজ্রধৃক' মন্ত্রপদ হইতে উৎপন্ন হন এবং তাঁহার শক্তি মামকী 'দ্বেষরতি' এই মন্ত্রপদ হইতে ঘনীভূত হইয়া দেবতাকারে প্রকাশিত হন। অক্ষোভ্যকুলের আর-একটি নাম দ্বেষকুল। দ্বেষ তমোগুণের দ্যোতক বলিয়া এই কুলের বর্ণ নীল।

বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় অনেক দেবতা এই অক্ষোভ্যকুলের অন্তর্গত। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে পুরুষদেবতা আবার অনেকে স্ত্রীদেবতা। ইঁহাদের সংখ্যা এত বেশি যে দুই প্রকারের দেবতাকে

দুই অধ্যায়ে বিভক্ত না করিলে উপায় নাই। এই অধ্যায়ে সেইজন্য অক্ষোভ্যকুলের পুংদেবতাগুলির বিবরণ দেওয়া হইল। সকল দেবতাই স্ব স্ব মস্তকোপরি একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্যমূর্তি ধারণ করিয়া স্বকুলের পরিচয় দিয়া থাকেন। অক্ষোভ্যের ভূমিস্পর্শ-মুদ্রা দেখিয়া অক্ষোভ্যকুলের দেবতাদিগকে চিনিয়া লইতে হয়।

চণ্ডরোষণ ॥ অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতা তান্ত্রিকদিগের অতি প্রিয় এবং ইহার নামে পৃথক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। ইঁহার বর্ণ পীত এবং আকৃতি ভীষণ। ইঁহার মুখ একটি ও হাত দুইটি এবং ইনি শক্তির সহিত একত্র বিরাজ করেন। ইঁহার বাম চরণ ভূমিলগ্ন থাকে এবং দক্ষিণ চরণ ঈষদুন্নত থাকে। ইঁহার ডান হাতে উদ্যত খড়্গ থাকে এবং ইনি বাম করে পাশবেষ্টিত তর্জনী-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। ইঁহার মুখ দংষ্ট্রাকরাল, মাথা মুণ্ডমালালংকৃত, চক্ষুত্রয় আরক্ত ও ঘূর্ণমান এবং বদন ক্রোধাবেশে উদ্‌ভাসিত। অগ্নিশিখার ন্যায় ইঁহার পিঙ্গল কেশরাজি ঊর্ধ্বে উত্থিত হওয়ায় ইঁহার মূর্তি ভীষণদর্শনা হয়। দেবতার মস্তকোপরি একটি ক্ষুদ্র আক্ষোভ্যমূর্তি বিরাজ করে।

হেরুক ॥ বৌদ্ধ দেবসংঘে হেরুক একজন অতি জনপ্রিয় ও শক্তিশালী দেবতা। ইঁহার জন্য পৃথক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। হেরুকের অনেক প্রকারের মূর্তি কল্পিত হইয়াছিল। কোনোটি দ্বিভুজ, কোনোটি চতুর্ভুজ, কোনোটি ষড়্‌ভুজ, আবার কোনোটি ষোড়শভুজ। এখানে তাঁহার মূলমূর্তি দ্বিভুজ হেরুকের বিবরণ দেওয়া হইল। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে আমূল বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর হইল না।

দ্বিভুজ মূর্তিতে হেরুক নীলবর্ণবিশিষ্ট এবং একক বিরাজ করেন, তাঁহার সহিত শক্তি থাকে না। তিনি একমুখ এবং দ্বিভুজ এবং তাঁহার আকৃতি ভীষণদর্শনা। তাঁহার বদনমণ্ডল ক্রোধাবেশে উদ্‌ভাসিত এবং দংষ্ট্রাকরাল।

তাঁহার চক্ষু বহিরাগত এবং আরক্ত। তাঁহার কেশরাজি অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্ধ্বে উত্থিত। তিনি শবের উপর বামপদ বিন্যাস করেন এবং দক্ষিণপদ বামপদের উরুতে ন্যস্ত করিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। ইঁহাকেই অর্ধপর্যঙ্ক নাট্যাসন নামে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ হস্তে তাঁহার উদ্যত বজ্র থাকে এবং বাম হস্তে হৃৎপ্রদেশে রক্তপরিপূর্ণ কপাল থাকে। বামস্কন্ধ হইতে অবলম্বিত পৈতার ন্যায় একটি খট্বাঙ্গ দেখা যায় এবং সেই খট্বাঙ্গের ঊর্ধ্বদেশ হইতে পতাকা দূর পর্যন্ত উড়িতে থাকে। এইরূপ মূর্তি একটি ঢাকার জাদুঘরে আছে। বাংলাদেশে আরও দুই-একটি পাওয়া গিয়াছে। নেপালে, তিব্বতে ও মাঞ্চুরিয়ায় হেরুকের এই মূর্তি পাওয়া যায়। হেরুকের সহিত যখন শক্তি থাকে তখন তাঁহার নাম হয় হেবজ্র। সেসব মূর্তি এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

বুদ্ধকপাল॥ সাধনমালায় লিখিত একটি বচন হইতে জানা যায় যে, যখন হেরুক তাঁহার শক্তি চিত্রসেনার সহিত সম্মিলিত হন তখন তাঁহার নাম হয় বুদ্ধকপাল। কাজেই বুদ্ধকপাল হেরুকেরই যে একটি মূর্তিভেদ সে সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ থাকে না। বুদ্ধকপালের মূর্তি ভীষণাকৃতি, দংষ্ট্রাকরাল মুখ, অগ্নিশিখার ন্যায় কেশরাজি, আরক্তচক্ষু এবং ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল। ইনি একমুখ ও চতুর্ভুজ এবং ইঁহার বর্ণ নীল। চারিটি হস্তে খট্বাঙ্গ, কপাল, কর্ত্রি এবং ডমরু ধারণ করেন, অর্ধপর্যঙ্কে নৃত্যাসনে দণ্ডায়মান থাকেন এবং তাঁহার কণ্ঠ ধরিয়া শক্তি তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। বুদ্ধকপালের জন্যও পৃথক্ তন্ত্র রচিত হইয়াছিল।

সম্বর॥ সাধনমালা হইতে জানা যায় যে, যখন হেরুক তাঁহার শক্তি বজ্রবারাহীর সহিত সম্মিলিত হন, তখন তাঁহার নাম বজ্রডাক হয়। এই

বজ্রডাকের আর একটি নাম সম্বর। এই দেবতার জন্যও পৃথক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। সম্বরের রং নীল, মুখ একটি ও হাত দুইটি। ইনি আলীঢ়াসনে ভৈরবের সহিত কালরাত্রিকে পদদলিত করেন এবং ইঁহার আকৃতি ভয়ংকর এবং অশেষ ভীতিপ্রদ। ইনি বজ্রবারাহীর সহিত আলিঙ্গিত অবস্থায় প্রকাশিত হন। ইঁহার দুই হাতে বজ্র এবং ঘণ্টা থাকে। শক্তি বজ্রবারাহীর এক হাতে বজ্র ও অপর হাতে কপাল শোভিত হইয়া থাকে। সম্বর দেবতা বর্ণমালার সমস্ত অক্ষরের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হন। ইঁহার আর-একটি দ্বাদশভুজ মূর্তি কল্পিত হয়।

সপ্তাক্ষর॥ বজ্রবারাহীর সহিত হেরুকের মিলন হইলে হেরুকের আর-একটি নাম হয় সপ্তাক্ষর। সপ্তাক্ষরের অর্থ সাতটি অক্ষর এবং এই দেবতার মন্ত্র সাতটি অক্ষরে নির্মিত হয় বলিয়া এই জাতীয় হেরুককে সপ্তাক্ষর বলা হয় তাঁহার সপ্তাক্ষরের মন্ত্রটি এই : 'হ্রীঃ হ হ হুঁ হুঁ ফট্'। সপ্তাক্ষর নীল মূর্তি, ত্রিমুখ এবং ষড়্ভুজ; ইনি আলীঢ় পদে দাঁড়াইয়া ভৈরব ও কালরাত্রিকে পদদলিত করেন। সপ্তাক্ষর হেরুকের ন্যায় ভীষণদর্শন এবং ইনি স্বশক্তি বজ্রবারাহী দ্বারা আলিঙ্গিত হন। ইঁহার প্রথম মুখ নীল, দক্ষিণ পীত এবং বাম হরিদ্বর্ণ। তিনটি দক্ষিণ হস্তে কপাল, খট্বাঙ্গ এবং ত্রিশূল ধারণ করেন এবং তিনটি বাম হস্তে বজ্র, ঘণ্টা এবং নরচর্ম ধারণ করেন।

মহামায়া॥ হেরুক যখন তাঁহার শক্তি বুদ্ধডাকিনী কর্তৃক যুগনদ্ধ মূর্তিতে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার নাম হয় মহামায়া। মহামায়ার মূর্তি অপরাপর হেরুক-মূর্তির ন্যায়ই ভীষণদর্শনা। তাঁহার মুখ চারিটি নীল, পীত, শ্বেত এবং হরিৎ বর্ণের। তাঁহার হাত চারিটি; দুইটি দক্ষিণ ভুজে কপাল ও শর থাকে এবং দুইটি বাম ভুজে খট্বাঙ্গ ও ধনু থাকে। তাঁহার চারিদিকে

চারিটি পরিবার দেবতা দেখা যায়। তাহাদের নাম যথাক্রমে বজ্রডাকিনী পূর্বে, রত্নডাকিনী দক্ষিণে, পদ্মডাকিনী পশ্চিমে এবং বিশ্বডাকিনী উত্তরে।

হয়গ্রীব॥ অক্ষোভ্যকুলের দেবতা হয়গ্রীব অমিতাভের সন্ততি সপ্তশতিক হয়গ্রীব হইতে বিভিন্ন। এখানে হয়গ্রীব অক্ষোভ্যকুলের অন্যান্য দেবতার ন্যায় ভীষণদর্শন। তাঁহার মুখ দংষ্ট্রাকরাল, তাঁহার আভরণ সর্প ও নরাস্থি নির্মিত, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, কেশরাজি অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্ধ্বে উত্থিত। হয়গ্রীবের রং লাল, মুখ তিনটি এবং হাত আটটি। তিনি ললিতাসনে দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহার মূলমুখ লাল, দক্ষিণ মুখ নীল এবং বামমুখ শুক্ল বর্ণের। দেবতা চারিটি দক্ষিণ হস্তে বজ্র, দণ্ড, করণমুদ্রা ও উদ্যত শর ধারণ করেন। চারিটি বামহস্তের একটিতে তর্জনীমুদ্রা প্রদর্শন করেন, দ্বিতীয়টিতে স্ববক্ষ স্পর্শ করেন, তৃতীয়ে পদ্ম এবং চতুর্থে ধনু থাকে।

যমারি॥ অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। যমের অরি অর্থাৎ শত্রু বা নিহন্তা হিসাবে তাঁহার স্থান ছিল অতি উচ্চ। এমন কি পৃথক পৃথক তন্ত্র তাঁহার নামে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার মূর্তির মুখ্যত দুই ভেদ আছে, একটি নীল বা কৃষ্ণ বর্ণের, আর-একটি রক্ত বর্ণের। কৃষ্ণমূর্তিতে তিনি হন কৃষ্ণযমারি এবং রক্ত মূর্তিতে তাঁহার নাম হয় রক্তযমারি। তন্ত্রগ্রন্থে তাঁহার নানা রূপ বর্ণিত আছে, সেসকল রূপ এখানে বর্ণনা সম্ভব হয় না বলিয়া মূল একটি রূপ দিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল।

রক্তযমারির বর্ণ লাল, মুখ একটি এবং হাত দুইটি। তাঁহার মূর্তি ভীষণ ভয়প্রদ। তিনি প্রত্যালীঢ় পদে যমরূপী মহিষকে দলন করেন। দক্ষিণ করে রক্তার্দ্র, পীতবর্ণ, নরমুণ্ডাঙ্কিত সিতদণ্ড ধারণ করেন এবং বাম করে রক্ত পরিপূরিত কপাল হৃৎপ্রদেশে ধারণ করেন। কখনও তিনি নিজ প্রভা

হইতে উৎপন্ন দ্বিভুজা একমুখী প্রজ্ঞা বা শক্তির সহিত আলিঙ্গিত হন।

কৃষ্ণযমারিরূপে তিনি কৃষ্ণবর্ণ একমুখ ও দ্বিভুজ। তাঁহার মূর্তি ভীষণদর্শনা। তিনি প্রত্যালীঢ় পদে যমরূপী মহিষোপরি আরোহণ করেন এবং দক্ষিণ করে বজ্রাঙ্কিত উদ্যতদণ্ড এবং বাম করে বক্ষের নিকট পাশযুক্ত তর্জনী-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। কখনও কখনও তাঁহাকে প্রজ্ঞাসহিত দেখা যায়।

জম্ভল॥ জম্ভলকে কেহ কেহ অক্ষোভ্যকুলের, আবার কেহ কেহ রত্নসম্ভবকুলের দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। অভোক্ষ্যকুলের জম্ভল মাথায় একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য মূর্তি ধারণ করেন, রত্নসম্ভবকুলে রত্নসম্ভবের বরদ-মুদ্রাযুক্ত ক্ষুদ্র মূর্তি ধারণ করেন। ইঁহাদের আরও কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। যথাযোগ্য স্থানে, তাহার উল্লেখ করা হইবে। জম্ভল ধনরত্নাদির দেবতা। জম্ভলের উপাসনা করিলে, জম্ভলদেবতার দর্শন হইলে জম্ভলের মন্ত্র অনন্যমনা হইয়া বহুকাল জপ করিতে পারিলে ধনরত্নাদির অভাব থাকে না। তাই জম্ভলের উপাসনা গরিব বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিতর এত জনপ্রিয় হইয়াছিল। সকল বৌদ্ধদেশে জম্ভলের প্রস্তর এবং ধাতু নির্মিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। জম্ভলের মন্ত্রপদ: 'ওঁ জম্ভলজলেন্দ্রায় স্বাহা'। এটি একটি শক্তিশালী সিদ্ধমন্ত্র এবং অনন্যমনা এবং বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া এক লক্ষ বার জপ করিলে জম্ভলসিদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। জপ করিবার সময় দক্ষিণ হস্তপুটে জল লইয়া এক চুলুক প্রত্যেক পাঠের সহিত জম্ভলকে দিতে হয়।

অক্ষোভ্যকুলের জম্ভল ত্রিমুখ, ষড়্ভুজ এবং প্রজ্ঞালিঙ্গিত। খুব সম্ভব ইঁহার রং নীল। তিনি দক্ষিণ ভুজত্রয়ে মাতুলুঙ্গ ফল, অঙ্কুশ ও বাণ প্রদর্শন করেন। বাম ভুজত্রয়ের একটি ভুজে প্রজ্ঞাকে ধরিয়া থাকেন,

দ্বিতীয়ে পাশবন্ধ নকুল এবং তৃতীয়ে ধনু বহন করিয়া থাকেন।

জম্ভলের আর-একটি রূপ আছে সেটিকে বলে উচ্ছুষ্ম বা ডিম্ভ। ইনি পঞ্চবর্ষীয় কুমারাকৃতি, উলঙ্গ, সর্পাভরণে ভূষিত এবং ইঁহার বদনমণ্ডল ক্রোধোদ্ভাসিত। ইনি প্রত্যালীঢ় পদে সুপ্ত ধনদকে পদদলিত করেন এবং তাহার মুখ হইতে ধনরত্নাদি উদ্‌গীরিত করেন। দেবতার বামহস্তে নকুল থাকে এবং সেটির মুখ হইতেও ধনরত্নাদি উদ্‌গীরিত হয়। দক্ষিণহস্তে বক্ষের নিকট কপাল থাকে এবং তাহা উচ্ছুষ্ম পূর্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন।

বিঘ্নান্তক।। অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতা প্রধানত দ্বারপালরূপে পরিগণিত হন। বিঘ্ন অর্থ বাধা, কিন্তু বজ্রযানে বিঘ্ন বলিতে হিন্দু দেবতা গণেশকে বুঝায়। যেহেতু গণেশ সিদ্ধিদাতারূপে পূজিত হইয়া থাকেন, সেইজন্য বৌদ্ধরা তাঁহাকে বিঘ্নরূপী মনে করেন এবং বিঘ্নান্তকের কল্পনা করেন। বিঘ্নান্তক-মূর্তিতে গণেশকে দেবতার পদতলে নিষ্পেষিত অবস্থায় দেখা যায়।

বিঘ্নান্তক নীলমূর্তি, একমুখ, দ্বিভুজ ও ভীষণদর্শন। দক্ষিণ করে উদ্যত বজ্র এবং বাম করে পাশযুক্ত তর্জনী-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। প্রত্যালীঢ় পদে ইনি গণেশকে পদদলিত করেন। ইঁহার আরও অনেক প্রকার রূপ আছে গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে তাহা আর এখানে দেওয়া সম্ভব হইল না।

বজ্রহুংকার।। অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতার বর্ণ নীল এবং ইঁহার মূর্তি ভীষণদর্শনা। ইঁহার মুখ একটি ও হাত দুইটি। দুইটি হাতে বজ্র ও ঘণ্টা ধারণ করিয়া অঙ্গুলি জড়াইয়া বজ্রহুংকার-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। এই বিশেষ মুদ্রা হইতেই দেবতার নাম বজ্রহুংকার। ইনি প্রত্যালীঢ় পদে ভৈরবকে পদদলিত করেন। ইঁহার আর-একটি ত্রিমুখ ও ষড়্‌ভুজ মূর্তি আছে। তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

ভূতডামর ।। ভূতডামরকে হিন্দুরাও যেমন মানে বৌদ্ধরাও তেমনই। ভূতডামরের একখানি হিন্দুতন্ত্র আছে, আবার একখানি বৌদ্ধতন্ত্রও আছে। দুইটি মিলাইলে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় । ভূতডামরের বর্ণ অক্ষোভ্যের ন্যায় নীল বা কৃষ্ণ। ইঁহার মূর্তি ভীতিপ্রদ ও জ্বালামালাকুল। ইনি একমুখ এবং চতুর্ভুজ। দুইটি প্রধান ভুজে ভূতডামর-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। অপর দক্ষিণ হস্তে উদ্যত বজ্র ধারণ করেন এবং অপর বামে তর্জনী-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। ইনি প্রত্যালীঢ় পদে ভূতপ্রেতাদির দেবতা অপরাজিতকে নিষ্পেষণ করেন।

বজ্রজ্বালানলার্ক ।। আক্ষোভ্যকুলের এই দেবতার বর্ণ নীল, আকৃতি ভীতিপ্রদ ও জ্বালামালাকুল, চতুর্মুখ ও অষ্টভুজ। ইনি আলীঢ় পদে সপত্নীক বিষ্ণুকে পদদলিত করিয়া থাকেন। চারিটি মুখে শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস ও করুণ রস অভিব্যঞ্জিত হইয়া থাকে। চারিটি দক্ষিণভুজে বজ্র, খড়্গ, চক্র ও বাণ ধারণ করেন। চারিটি বাম করে ঘণ্টা. ধনু. পাশ এবং বিচিত্র পতাকাযুক্ত খট্বাঙ্গ ধারণ করেন।

ত্রৈলক্য বিজয় ।। এই দেবতার কুলেশ অক্ষোভ্য। ইঁহার বর্ণ নীল ও মূর্তি ভীতিপ্রদ। ইনি চতুর্মুখ ও অষ্টভুজ। প্রত্যালীঢ় পদে ইনি শিব ও গৌরীকে পদদলিত করেন। ইঁহার প্রথম মুখ সক্রোধশৃঙ্গার রস, দ্বিতীয় রৌদ্র রস, বাম মুখ বীভৎস রস এবং পশ্চাতের মুখ বীররস প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রধান ভুজদ্বয়ে ঘণ্টা ও বজ্র ধারণ করিয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিসংযুক্ত করিয়া হৃদঁয়দেশে বজ্রহুংকার মুদ্রা ধারণ করেন। দক্ষিণ করত্রয়ে খট্বাঙ্গ, অঙ্কুশ ও বাণ এবং বাম করত্রয়ে ধনু পাশ ও বজ্র ধারণ করেন। বজ্রহুংকার মুদ্রার আর-একটি নাম ত্রৈলোক্যবিজয়-মুদ্রা। এই দেবতার দুই-একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি আছে

বুদ্ধগয়ার মোহন্তের মন্দিরে।

পরমাশ্ব॥ অক্ষোভ্যকুলের এই দেবতাটির মূর্তি অদ্ভুত প্রকারের। ইঁহার নাম পরমাশ্ব অর্থ শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। নাম হইতে মনে হয় ইঁহার সহিত হয়গ্রীবের কিছু সম্বন্ধ আছে। ইঁহার রং লাল এবং ইনি চতুর্মুখ ও অষ্টভুজ এবং অশ্বের ন্যায় চতুষ্পদ। চারিটি মুখের একটি অশ্বমুখ এবং একটি ব্রহ্মমুখ অর্থাৎ ব্রহ্মার চতুর্মুখযুক্ত একটি কাটামাথা বসানো। মূলমুখ রক্ত সক্রোধশৃঙ্গার, দক্ষিণ রৌদ্র, বাম মুখ ব্রহ্মমুখ এবং ঊর্ধ্বমুখ হরিত অশ্বমুখ। চারিটি দক্ষিণ হস্তের একটিতে বিশ্ববজ্র সহিত 'উত্তিষ্ঠ' অভিনয় করেন, দ্বিতীয়টিতে ত্রিপতাকা-মুদ্রা ধারণ করিয়া ওইরূপ 'উত্তিষ্ঠ' অভিনয় করেন। তৃতীয়ে খড়্গ ও চতুর্থে বাণ থাকে। বামের প্রথমে ছড়ির সহিত বিশ্বপদ্ম, দ্বিতীয়ে শক্তি, তৃতীয়ে দণ্ড ও চতুর্থে ধনু ধারণ করেন। প্রত্যালীঢ় পদে দাঁড়াইয়া প্রথম দক্ষিণ পদে ইন্দ্রাণী ও লক্ষ্মীকে ও দ্বিতীয় দক্ষিণ পদে রতি ও প্রীতিকে দলন করেন। বামে প্রথম পদদ্বারা ইন্দ্র ও মধুকরকে এবং দ্বিতীয় চরণ দ্বারা জয়কর ও বসন্তকে দলিত করিয়া থাকেন। এইরূপ চতুষ্পদবিশিষ্ট অদ্ভুত রূপে দেবতা আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

যোগাম্বর॥ যে দেবমণ্ডলে যোগাম্বর অপরাপর দেবতার সহিত পূজিত হন তাহার একটি বিবরণ নিষ্পন্নযোগাবলীতে দেওয়া আছে। ইঁহার কুলেশ অক্ষোভ্য আদি পঞ্চ তথাগত। ইনি অক্ষোভ্যের ন্যায় নীলবর্ণ ত্রিমুখ এবং ষড়্ভুজ। ইনি সিংহের উপর অর্ধপর্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট। ইঁহার মূলমুখ নীল, দক্ষিণ শুক্ল এবং বাম রক্তবর্ণ। মূল ভুজদ্বয়ে বজ্র ও বজ্রাঙ্কিত ঘণ্টা ধরিয়া তিনি স্বকীয় প্রজ্ঞা জ্ঞানডাকিনীকে আলিঙ্গান করেন। একটি দক্ষিণ করে শক্তিকে স্পর্শ করেন ও অপরটিতে বাণ বহন করেন। দুইটি বামভুজে পদ্মভাজন এবং ধনু ধারণ করেন।

কালচক্র ॥ কালচক্র আদিবুদ্ধ যান বা আদি যানের প্রধান দেবতা। এই যানকে দেবতার নাম অনুসারে কালচক্র যানই বলা হইয়া থাকে। কালচক্রের উপর একখানি পৃথক তন্ত্র লেখা হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের ইহা একখানি মৌলিক তন্ত্র এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। অদ্যাবধি ইহা ছাপা হয় নাই। কালচক্র তন্ত্রের একখানি বিশেষ দামি টীকা আছে, তাহার নাম বিমলপ্রভা। এই টীকাখানি ইতালির বিশ্বপণ্ডিত Giuseppe Tucci ছাপাইতেছেন এবং নিপুণভাবে কালচক্র যানের তথ্যাদি অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে অনেক বহুমূল্য ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কালচক্র দেবতার একটি মূর্তির বিশদ পরিচয় নিষ্পন্নযোগাবলীতে পাওয়া যায়। কালচক্রমণ্ডলে প্রাপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় তাঁহার মূর্তি অক্ষোভ্যের ন্যায় নীলবর্ণ। তাহার মুখ চারিটি এবং হাত চতুর্বিংশতি। তিনি আলীঢ় আসনে অনঙ্গ এবং রুদ্রদেবতার শয়ান দেহের উপর নৃত্য করিতে থাকেন। তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম এবং চারিটি মুখে বারোটি চক্ষু থাকে। তাঁহার গ্রীবা তিনটি এবং স্কন্ধ ছয়টি। প্রধান হাত চব্বিশটি, তাহার বারোটি দক্ষিণে আর বারোটি বামে। প্রধান হাতের পর অনেকগুলি গৌণ হাত আছে। সর্বশুদ্ধ প্রধান ও অপ্রধানে মিলাইয়া তাঁহার হাত চব্বিশ সহস্র। মূল হাত অবশ্য চব্বিশটি, এক এক দিকে বারোটি করিয়া। এই হাতের রং আবার ভিন্ন ভিন্ন। দক্ষিণ দিকে নীল বর্ণের চারিটি হাতে বজ্র, অসি, ত্রিশূল ও কর্ত্রি থাকে; চারিটি রক্তবর্ণের হাতে অগ্নি, শর, বজ্র এবং অঙ্কুশ থাকে; এবং শুক্ল বর্ণের চারিটি হাতে চক্র, ছুরিকা, দণ্ড এবং পরশু থাকে। সেইরূপ বামদিকে নীলবর্ণ চারিটি হাতে ঘণ্টা, পাত্র, খট্বাঙ্গ ও কপাল থাকে; চারটি রক্তবর্ণ হস্তে ধনু, পাশ, রত্ন এবং পদ্ম থাকে;

এবং চারিটি শুক্লবর্ণ হস্তে দর্পণ, বজ্র, শৃঙ্খল এবং ব্রহ্মমুন্ড থাকে। সংক্ষেপে ইহাই কালচক্রের বিচিত্র মূর্তির বিবরণ। আশ্চর্যের বিষয়, যদিও তাঁহার ধাতু বা প্রস্তর মূর্তি বেশি দেখা যায় না, কাপড়ে আঁকা প্রাচীরচিত্র প্রচুর নেপালে ও তিব্বতে পাওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়

অক্ষোভ্যকুলের দেবীগণ

ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের স্ত্রী-সন্ততির সংখ্যা নেহাত অল্প নহে। সাধারণত ইহাদের বর্ণ নীল এবং পুরুষ-সন্ততির ন্যায় প্রায় সকলেই ভীষণদর্শনা। ইহাদের নরাস্থি নির্মিত আভরণ, সর্পনির্মিত ভূষণ, মুণ্ডের মালা, ব্যাঘ্রচর্মের বসন, অগ্নিজ্বালার ন্যায় ঊর্ধ্বে উত্থিত কেশরাজি, দংষ্ট্রাকরাল বদন, তিনটি আরক্ত ও বর্তুল চক্ষু, ক্রোধোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল স্বভাবতই ভীতির উদ্রেক করিয়া থাকে। সাধনার সময় মানসচক্ষে এইরূপ দেবতার দর্শন ঘটিলে সাধক প্রায়ই ভয়ে ভীত হইয়া সাধনা পরিত্যাগ করেন, কিংবা সংজ্ঞাহীন অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই অধ্যায়ে বর্ণিত দেবীগণ তাঁহাদের মস্তকের উপর একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্য মূর্তি ধারণ করিয়া স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। অক্ষোভ্যের স্ত্রী-সন্ততিদের বিবরণ এক এক করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল:

মহাচিনতারা॥ এই তারার উপাসনা মহাচিন হইতে আনা হইয়াছিল বলিয়া মহাচিনতারা নামকরণ করা হইয়াছে। ইঁহাকে উগ্রতারা নামেও অভিহিত করা হয়। ইঁহার মন্ত্র একটি সিদ্ধমন্ত্র। অনন্যমনা এবং বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া ধ্যান ও জপ করিলে উগ্রতারা সিদ্ধ হন। ইনি একমুখ, চতুর্ভুজ এবং ইঁহার মূর্তি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। ইনি প্রত্যালীঢ় পদে শবোপরি দণ্ডায়মান থাকেন। ইনি দুইটি দক্ষিণ হস্তে তরবারি এবং কর্ত্রি ধারণ করেন এবং দুইটি বাম হস্তে উৎপল ও কপাল ধারণ করেন। ইঁহার মস্তকে একটি ক্ষুদ্র অক্ষোভ্যমূর্তি বিরাজ করে। এই তারার ধ্যান ও সাধনা হিন্দুতন্ত্রে প্রচলিত আছে এবং দুইটি ধ্যান মিলাইয়া দেখিলে বোধ হয়

হিন্দু তান্ত্রিকেরা মহাচিনতারার উপাসনা ও মূর্তিকল্পনা বৌদ্ধদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।

জাঙ্গুলী॥ বজ্রযানী বৌদ্ধদের ভিতর জাঙ্গুলীদেবীর পূজা সাধনা মন্ত্রাদি বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তাহার প্রধান কারণ এই যে, দেবীকে তাহারা তাহাদের বিপদ-আপদের সময় কাজে লাগাইতে পারিত। সর্পদংশন হইতে রক্ষা করিতে এবং সর্পদংশন করিলে তাহার বিষ নষ্ট করিতে জাঙ্গুলী অদ্বিতীয় ছিলেন। জাঙ্গুলীর নাম শুনিলে সাপ পলাইয়া যায়, এ বিশ্বাস সেকালের বৌদ্ধদের ছিল। তাঁহার নাম করিলে সাপের বিষ শরীরে সঞ্চার করে না বলিয়াও তাহাদের বিশ্বাস ছিল। জাঙ্গুলীর মূর্তিকল্পনা নানারূপে করা হইয়াছিল। তাঁহার রং কখনও সাদা, কখনও হরিৎ, আবার কখনও পীত হয। শুক্লমূর্তিতে জাঙ্গুলী একমুখী ও চতুর্ভুজা, সৌম্যমূর্তি ও শ্বেতসর্পের অলংকারে বিভূষিতা। ইনি দুইটি প্রধান হস্তে বীণা ধারণ করেন, দ্বিতীয় দক্ষিণ করে অভয়-মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় বাম করে একটি শুক্লসর্প ধারণ করেন।

সাধনমালায় লিখিত আছে যে, জাঙ্গুলীর নিম্নলিখিত মন্ত্র একবার পাঠ করিলে সপ্ত বৎসর যাবৎ সর্প দংশন করিতে পারে না। আর যদি মুখস্থ করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে যাবজ্জীবন সর্পদংশন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। মন্ত্রটি লিখিয়া কবচরূপে শরীরে ধারণ করিলেও উক্ত ফল পাওয়া যায়। মন্ত্রপদ এই : 'ওঁ ইলিমিত্তে তিলিমিত্তে ইলিতিলিমিত্তে দুম্বে দুম্বালীয়ে তর্কে তর্করণে মর্মে মর্মরণে কশ্মীরে কশ্মীরমুক্তে অঘে অঘনে অঘনাঘনে ইলি ইলীয়ে মিলীয়ে ইলিমিলীয়ে অক্যাইএ অপ্যাইএ শ্বেতে শ্বেততুণ্ডে অননুরক্তে স্বাহা'।

ইহা ছাড়াও জাঙ্গুলীর আরও অনেক মন্ত্র আছে, তাহার ভিতর একটি

সর্পের সম্মুখে পাঠ করা একেবারে বারণ। তাহার কারণ এই যে, মন্ত্রপদের শব্দগুলি কোনো সর্প সহ্য করিতে পারে না এবং শুনিলেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তাহাদের মস্তক সপ্তধা স্ফুটিত হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সাধনমালা নামক বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। জাঙ্গুলীর মূর্তি প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। হিন্দুদের মনসাদেবীকে জাঙ্গুলীর প্রতিরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

একজটা ॥ অক্ষোভ্যকুলের এই দেবীর মন্ত্ররাজকে মহাশক্তিশালী বলা হইয়াছে। ইঁহার মন্ত্র একবার শ্রবণ করিলেই মানব নির্বিঘ্ন হইয়া থাকে। তাহার নিত্য সৌভাগ্য হইয়া থাকে, তাহার শত্রু ধ্বংস হয়, তাহার ধর্মে মতি হয় এবং ক্রমে নিঃসংশয়ে বুদ্ধতুল্য হইয়া থাকে। সাধনমালায় কথিত আছে, আর্য নাগার্জুন ভোট দেশ হইতে একজটার সাধনা উদ্ধার করিয়া আনেন। ইঁহার নাম একজটা হইবার কারণ এই যে, ইঁহার মাথার কেশরাজি জড়িত হইয়া একটি জটার আকারে মস্তকোপরি উত্থিত হইয়া থাকে। একজটার মূর্তি নানাভাবে কল্পিত হইয়াছে। দ্বিভুজ মূর্তি হইতে চতুর্বিংশতিভুজ মূর্তি তাঁহার দেখা যায়। সমস্ত মূর্তিগুলির বিবরণ দিতে হইলে গ্রন্থ ভারী হইয়া যায়, সেইজন্য তাহা হইতে বিরত হইতে হইল।

একজটার রং নীল এবং তাঁহার মূর্তি ভীষণদর্শনা। তাঁহার কেশরাজি পিঙ্গলবর্ণ এবং অগ্নিশিখার ন্যায় মস্তকের উপর উত্থিত হইয়া থাকে। তিনি একমুখী এবং দ্বিভুজা এবং একটি হাতে কর্ত্রি ও অপর হাতে কপাল ধরিয়া থাকেন। তিনি শবোপরি প্রত্যালীঢ় পদে দাঁড়াইয়া থাকেন।

চতুর্ভুজ মূর্তিতে দুইটি দক্ষিণ হস্তে শর ও অসি ধারণ করেন এবং দুইটি বাম হস্তে ধনু ও কপাল ধারণ করেন।

ইঁহার অষ্টভুজা মূর্তিরও বিবরণ পাওয়া যায়। কখনও কখনও ইঁহার

আটটি মুখ এবং চতুর্বিংশতি হস্ত হইয়া থাকে। এই মূর্তিতে তিনি বিদ্যুজ্জ্বালা করালী নামে পরিচিত।

পর্ণশবরী॥ অক্ষোভ্য সন্ততিদের ভিতর পর্ণশবরীর মহত্তা কম নয়। আজকাল প্লেগ কলেরা বসন্ত ইত্যাদি মহামারি দেখা দিলে আমরা ছুটি টিকাদারদের কাছে এবং একটা কিছু নোংরা রস শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া মৃত্যুভীতি নিবারণ করি। ঠিক সেইরূপ পূর্বে মহামারি দেখা দিলে লোকে মহাধূমধামে দেবদেবীর পূজা করিয়া মন্ত্রোচ্চারণাদি করিয়া শব্দের তরঙ্গে দূষিত হাওয়াকে শুদ্ধ করিত। হোমের শুদ্ধ ঘি পুড়িয়া যে ধূম উদ্‌গত হইত তাহাতেও দূষিত হাওয়া শুদ্ধ হইত। পর্ণশবরীর পূজা মন্ত্র হোম ইত্যাদির দূষিত হাওয়া শুদ্ধ করিবার শক্তি ছিল বলিয়া মারিকালে তাঁহার পূজার প্রচলন হইয়াছিল। তাঁহার বড়ো প্রস্তরমূর্তি দুইটি পূর্ববঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খুব সম্ভব এগুলি পাকা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজিত হইত। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরগুলি ধ্বংস হওয়ায় প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলির আজ এই দুর্দশা হইয়াছে। বৌদ্ধ মূর্তিশাস্ত্রের চর্চা না থাকিলে মূর্তিগুলি যে বৌদ্ধপন্থী তাহাও লোকে ভুলিয়া যাইত।

পর্ণশবরী ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের সন্ততিরূপে অক্ষোভ্যের ক্ষুদ্রমূর্তি মস্তকের উপরে ধারণ করেন। ইঁহার কোনো কোনো মূর্তিতে অমোঘসিদ্ধির ক্ষুদ্র মূর্তি থাকে। উহার বর্ণনা যথাস্থানে দেওয়া হইবে।

পর্ণশবরীর রং হলদে, তাঁর মুখ তিনটি এবং হাত ছয়টি। তিনি প্রত্যালীঢ় পদে মারিরূপ বিঘ্নরাজির উপর দাঁড়াইয়া থাকেন। তিনি পর্ণভূষণা এবং পর্ণবসন পরিধান করেন। তাঁহার মূল মুখ পীত, দক্ষিণ মুখ শুক্ল এবং বাম মুখ রক্তবর্ণ এবং ললিত হাস্যে উদ্ভাসিত। তাঁহার তিনটি দক্ষিণ হস্তে বজ্র পরশু ও শর থাকে এবং বাম হস্তত্রয়ে পাশযুক্ত তর্জনী, পর্ণগুচ্ছ এবং ধনু

থাকে। কোনো কোনো প্রস্তরমূর্তিতে মারি স্থানে গণেশের মূর্তি পর্ণশবরীর পদতলে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রজ্ঞাপারমিতা॥ ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের সন্ততিদের মধ্যে প্রজ্ঞা-পারমিতার একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। প্রজ্ঞাপারমিতা একটি বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম। শূন্যবাদের আদিগ্রন্থ অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা এবং বিজ্ঞানবাদের আদিগ্রন্থ পঞ্চবিংশতি-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা। মহাযানীদের এবং মহাযান হইতে উদ্ভূত সকল প্রকার যানের অনুযায়ীদের নিকট প্রজ্ঞাপারমিতা সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয় এবং ইহা সকল বৌদ্ধদেরই আদরের সামগ্রী। কথিত আছে, নাগার্জুন এই গ্রন্থ নাগলোক হইতে উদ্ধার করিয়া জগতে প্রচার করেন।

প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তককে দেবীরূপে বজ্রযানে কল্পনা করা হইয়াছিল। এইরূপ পুস্তককে দেবীরূপে কল্পনা করার একটা প্রথা বৌদ্ধধর্মে ছিল, কারণ নিষ্পন্নযোগাবলীতে দ্বাদশধারিণী গ্রন্থকে দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া দ্বাদশটি পারমিতাকেও দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যেও প্রজ্ঞাপারমিতা আছেন। সে কথা পরে হইবে।

প্রজ্ঞাপারমিতা নানারূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, তাহার ভিতর দুই-একটি রূপ এখানে দেওয়া হইল।

প্রজ্ঞাপারমিতা একমুখী এবং দ্বিভুজা। ইনি শ্বেতপদ্মের উপর বসিয়া থাকেন এবং ইঁহার শরীরের বর্ণ শুভ্র। ইনি দক্ষিণ হস্তে রক্তপদ্ম এবং বাম হস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক ধারণ করেন। ইঁহার মাথায় অক্ষোভ্যের ক্ষুদ্রমূর্তি দেখা যায়।

আর-একটি দ্বিভুজরূপে ইঁহার বর্ণ পীত হয় এবং দুই হাতে ইনি ব্যাখ্যান বা ধর্মচক্রমুদ্রা প্রদর্শন করেন। ইঁহার বামপার্শ্বে একটি পদ্ম উত্থিত হয়

এবং তাহার উপর প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক দেখা যায়। প্রজ্ঞাপারমিতা জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী বলিয়া তাঁহার মূর্তি অতিশয় সৌম্য এবং মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ। লাইডেনে প্রাপ্ত প্রজ্ঞাপারমিতার একটি মূর্তিতে এই অসীম মাতৃস্নেহ যেন অণুতে পরমাণুতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বজ্রচর্চিকা ॥ অক্ষোভ্যকুলের এই দেবী ঠিক হিন্দু চামুন্ডার ন্যায় অস্থিসার। ইঁহার শরীরের সমস্ত হাড় বাহির হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ইঁহাকে দেখিতে অতি ভয়ংকর। প্রসারিত শবদেহের উপর পা রাখিয়া ইনি অর্ধপর্যঙ্কাসনে নৃত্য করিতে থাকেন। ইঁহার মুখ একটি এবং হাত ছয়টি। ইঁহার তিনটি দক্ষিণ হস্তে বজ্র, খড়্গ ও চক্র থাকে ও তিনটি বাম হাতে কপাল, রত্ন এবং পদ্ম থাকে। ভয়ের চেয়েও ভয়ংকরী চর্চিকার এই রূপ। এই দেবীর প্রস্তর কিংবা ধাতু মূর্তি এখন পর্যন্ত নজরে পড়ে নাই।

মহামন্ত্রানুসারিণী ॥ পঞ্চরক্ষা দেবীদের মধ্যে অক্ষোভ্য-কুলোৎপন্না মহামন্ত্রানুসারিণী অন্যতমা। ইঁহার বর্ণ নীল এবং ইনি একমুখী এবং চতুর্ভুজা। ইনি দুইটি দক্ষিণ হস্তে বজ্র ও বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দুইটি বাম হস্তে পরশু পাশ ধারণ করেন। ইনি মুকুটোপরি অক্ষোভ্যের ক্ষুদ্র মূর্তি ধারণ করেন এবং ইঁহার শরীরপ্রভা সূর্যমণ্ডলের প্রভার ন্যায়। মহামন্ত্রানুসারিণীর মূর্তি সৌম্য; অন্যান্য অক্ষোভ্য-সন্ততির ন্যায় ক্রূব বা ভয়ংকর নহে। আর একবার পঞ্চমহারক্ষার বিবরণ দিবার সময় এই দেবীর চর্চা করা হইবে।

মহাপ্রত্যঙ্গিরা॥ অক্ষোভ্যকুলের এই দেবীর রং নীল, মুখ একটি এবং হাত ছয়টি। তিনটি দক্ষিণ হস্তে ইনি খড়্গ, অঙ্কুশ ও বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং তিনটি বামহস্তে সপাশ তর্জনী রক্তপদ্ম ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন।

ধ্বজাগ্রকেয়ূরা॥ অক্ষোভ্যকুলের এই দেবীর দুইটি মূর্তি কল্পনা করা হয় এবং এই দুইটি মূর্তির ভিতর বিশেষ পার্থক্যও দেখা যায়।

প্রথমটিতে দেবী কৃষ্ণ বা নীল বর্ণ। ত্রিমুখী ও চতুর্ভুজা। তাঁহার মূর্তি ভীষণদর্শনা। তিনি প্রত্যালীঢ়াসনে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং দুইটি দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও পাশ থাকে এবং দুইটি বাম করে খট্বাঙ্গ ও চক্র থাকে।

দ্বিতীয় মূর্তিতে তাঁহার রং পীত, মুখ চারিটি ও হাত চারিটি। দুইটি দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও চক্র থাকে এবং দুইটি বাম হস্তে পাশযুক্ত তর্জনী এবং মুষল থাকে। একটি ত্রিশূল বাম স্কন্ধ হইতে ঝুলিতে থাকে। অন্যান্য বিষয়ে পূর্বোক্ত মূর্তির সহিত সাম্য দেখা যায়।

বসুধারা॥ অক্ষোভ্যকুলের এই দেবী জম্ভলের শক্তিরূপে পরিগণিত। ইনি শস্য সম্পদ ও ধনরত্নাদির দেবী। ইঁহার মূর্তি অন্যান্য অক্ষোভ্য-সন্ততির ন্যায় ক্রূর ও ভীতিপ্রদ নহে। বসুধারার মূর্তি শান্ত ও সৌম্য। ইঁহার মুখ একটি ও হাত দুইটি। দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং বাম হস্তে ধান্যের শিষ প্রদর্শন করেন। ইঁহার সহিত চারিটি পরিবার দেবী বিরাজ করেন। তাঁহাদের নাম শ্রীবসু, বসুশ্রী, শ্রীবসুমুখী এবং বসুমতীশ্রী।

নৈরাত্মা॥ অক্ষোভ্যকুলের এই দেবীকে নৈরাত্মা বলা হয়। যাঁহার আত্মা নাই তিনিই নৈরাত্মা। বলাবাহুল্য, নৈরাত্মা জগৎকারণ নিঃস্বভাব স্বভাবশুদ্ধ পরাশূন্যের একটি গুণ। এই গুণটিকে রূপায়িত করা হইয়াছে নৈরাত্মা নামক দেবীরূপে। ইঁহার বর্ণ নীল, একটি মুখ এবং দুইটি হাত, ইনি দেখিতে অতি ভীষণ। অগ্নিজ্বালার ন্যায় কেশরাজি। গলায় মুণ্ডমালা এবং ক্রোধাভ্রাসিত মুখমণ্ডল সত্যই দর্শকের মনে ভয়ের উদ্রেক করিয়া থাকে। ইনি শবোপরি অর্ধপর্যঙ্কাসনে নৃত্য করিতে থাকেন। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত কর্ত্রি এবং বামে হৃদ্‌প্রদেশে রক্তপূর্ণ কপাল থাকে। একটি

খট্বাঙ্গ তাঁহার বাম স্কন্ধ হইতে ঝুলিতে থাকে। নৈরাত্মাকে হেরুকের শক্তিরূপে সময়ে সময়ে কল্পনা করা হয়।

জ্ঞানডাকিনী॥ অক্ষোভ্যকুলের দেবী জ্ঞানডাকিনীর একটি মণ্ডলের বিবরণ নিষ্পন্নযোগাবলীতে দেওয়া আছে। ইঁহার বর্ণ নীল এবং ইঁহার তিনটি মুখ ও ছয়টি হাত। মূল মুখটি নীল, দক্ষিণ শুক্ল এবং বাম মুখ রক্তবর্ণ এবং শৃঙ্গাররসের দ্যোতক। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে ঊর্ধ্বে উত্থিত খট্বাঙ্গ, পরশু এবং বজ্র থাকে। বাম হস্তত্রয়ে ঘণ্টা, রক্তপূর্ণ কপাল এবং খড়্গ থাকে। দেবীর মূর্তি ভীষণদর্শনা।

বজ্রবিদারণী॥ এই দেবী পঞ্চমুখী ও দশভুজা। পাঁচটি দক্ষিণ হস্তে ইনি অঙ্কুশ, খড়্গ, শর, বজ্র ও বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন ; এবং পাঁচটি বাম ভুজে পাশ, চর্ম, ধনু, ধ্বজা এবং অভয়মুদ্রা ধারণ করেন। ইনি প্রত্যালীঢ় পদে দাঁড়াইয়া থাকেন।

অষ্টম অধ্যায়

বৈরোচন কুল

বৈরোচনকুলের প্রবর্তক ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন। বৈরোচন যে অন্যান্য ধ্যানীবুদ্ধের ন্যায় জগৎকারণ পরাশূন্যেরই একটি রূপভেদ তাহা তাঁহার নাম হইতেই প্রকাশ পায়। বজ্রযান দর্শনে শূন্য ছাড়া আর কিছুই নাই। এই শূন্যরস ঘনীভূত হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। বৈরোচন বলিতে বিশেষ রোচন অর্থাৎ শোভা যাঁহার তাঁহাকে বুঝায়। তিনিই শূন্যগুণী ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচনের শক্তি লোচনা বা রোচনা। ইঁহাদের কুলের নাম তথাগত কুল এবং চক্র এই কুলের প্রতীকচিহ্ন। সাধারণত বৈরোচনকুলের সকল দেবতাই শুক্লবর্ণ হইয়া থাকেন। যদিও এই নিয়মের যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখা যায়। বৈরোচন পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে রূপ নামক স্কন্ধের অধিপতি এবং ইঁহার স্থান মণ্ডলের ঠিক মধ্যভাগে। বৈরোচন হেমন্তঋতু, মধুররস, বর্ণমালার ক-বর্গ এবং প্রভাত ও সন্ধ্যা এই দুই সময়ের উপর আধিপত্য করেন। গুহ্যসমাজতন্ত্রে দেখা যায় বৈরোচন 'জিনজিক্' মন্ত্রপদ হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহার শক্তি 'মোহরতি' মন্ত্রপদ হইতে ঘনীভূত হইয়া দেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। সেইজন্য এই বৈরোচনকুলের বা তথাগতকুলের আর একটি নাম মোহকুল। মোহের বর্ণ শুক্ল বলিয়া বজ্রযানে পরিকল্পিত হইয়াছিল।

বৈরোচনের সন্ততি হিসাবে কতকগুলি দেবদেবীর নাম পাওয়া যায়, যদিও তাঁহাদের সংখ্যা বেশি নহে। এই কুলের দেবতারা মস্তকোপরি বোধ্যঙ্গী মুদ্রা বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র বৈরোচন মূর্তি ধারণ করিয়া স্বকুলের পরিচয় দিয়া থাকেন। এই কুলের একটি পুরুষ-দেবতা এবং অন্যান্য

স্ত্রী-দেবতার বিবরণ একটির পর একটি নিম্নে দেওয়া হইল। ধর্মচক্র মুদ্রা বৈরোচনের মুদ্রা। ইঁহাকে বোধ্যঙ্গী ও ব্যাখ্যান মুদ্রা নামেও অভিহিত করা হয়।

নামসঙ্গীতি॥ বৈরোচনকুলের এই দেবতা বজ্রপর্যঙ্কাসনে বা ধ্যানাসনে বসিয়া থাকেন। ইঁহার মুখ একটি এবং হাত বারোটি। ইঁহার শরীরের বর্ণ শুক্ল। এই শুক্লবর্ণ বৈরোচনের দ্যোতক। দেবতা প্রথম হস্তদ্বয়ে অঞ্জলিমুদ্রা, দ্বিতীয় হস্তদ্বয়ে অভয়মুদ্রা, তৃতীয় হস্তদ্বয়ে ক্ষেপণমুদ্রা, চতুর্থ হস্তদ্বয়ে সমাধিমুদ্রা এবং পঞ্চম হস্তদ্বয়ে তর্পণমুদ্রা প্রদর্শন করেন। বাকি একটি দক্ষিণ হস্তে বিশ্বপদ্মের উপর তরবারি এবং বাম হস্তে বজ্রাঙ্কিত খট্বাঙ্গ ধারণ করেন। নামসঙ্গীতির এই মূর্তিটি অদ্ভুত এবং বিস্ময়জনক। তিব্বতে ও নেপালে ইঁহার প্রস্তরনির্মিত ও ধাতুনির্মিত উভয় প্রকার মূর্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

মারীচী ॥ মারীচী বৈরোচনকুলের মুখ্য দেবী। মারীচী বৌদ্ধদিগের সূর্যদেবতা, দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। হিন্দুদের সূর্যদেবতা যেমন সপ্তাশ্বরথে বিচরণ করেন, মারীচী তেমনই সপ্তশূকর রথে আরূঢ়া। মরীচীর বিবরণ বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থে প্রভূত পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাঁহার রূপকল্পনাও নানাপ্রকারের দেখা যায়। এখানে একটি রূপের বিবরণ দেওয়া হইল, কারণ সবগুলি মূর্তি দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে।

মারীচী দেবীর প্রস্তরনির্মিত যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার ভিতর প্রায় সবগুলিই অষ্টভূজা এবং ত্রিমুখী। নিষ্পন্নযোগাবলীতে পরিবার দেবতা সহিত মারীচীর বিবরণ পাওয়া যায়। এটি কিন্তু ষড়্ভুজ মূর্তি।

অষ্টভুজ মূর্তিতে মারীচী দেবীর তিনটি মুখ এবং আটটি হাত। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় পীত এবং তিনি রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন। তিনি

মস্তকের উপর বৈরোচনের ক্ষুদ্র মূর্তি ধারণ করেন এবং চৈতের মধ্যভাগে অবস্থান করেন। তাঁহার প্রথম মুখটি পীতবর্ণ ও শৃঙ্গাররসের দ্যোতক। বাম মুখ নীলবর্ণ এবং শূকরমুখের ন্যায় বিকৃত, বীররস ব্যঞ্জক, দংষ্ট্রাকরাল এবং ললজিহ্বা। দক্ষিণ মুখ ঘন রক্তবর্ণ এবং শান্তরসের দ্যোতক। দেবী রথের উপর আলীঢ় পদে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং সেই রথ সাতটি শূকর কর্তৃক নীয়মান হয়। সাতটি শূকরের তলদেশে ভয়দর্শন রাহু অবস্থান করেন এবং তিনি দুই হস্তে সূর্য ও চন্দ্রকে ধরিয়া ভক্ষণরত থাকেন। দেবীর প্রধান হস্তদ্বয়ে সূচি ও সূত্র থাকে এবং ইহা দ্বারা তিনি দুষ্টসত্ত্বের মুখ ও চক্ষু সীবন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় হস্তদ্বয়ে অঙ্কুশ ও পাশ থাকে; তৃতীয় হস্তদ্বয়ে ধনু ও বাণ এবং চতুর্থ হস্তদ্বয়ে বজ্র এবং অশোকপল্লব ধারণ করেন।

মারীচী চারিজন পরিবার দেবতা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। তাঁহাদের নাম বর্তালী, বদালী, বরালী ও বরাহমুখী। মারীচীর পূজা বহুল পরিমাণে বৌদ্ধদের ভিতর প্রচলিত আছে,. বিশেষত নেপালে এবং তিব্বতে।

উষ্ণীষ বিজয়া।। বৈরোচনকুলের এই দেবীর নেপালে বেশ খাতির আছে। প্রায় প্রত্যেক বৌদ্ধমন্দিরে এবং বিহারে ইঁহার মূর্তি থাকে। ইনি চৈত্য গর্ভের অন্তর্বর্তী দেবতা বলিয়া ইঁহার মাথার উপর একটি চৈত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি শুক্লবর্ণা ত্রিমুখা এবং অষ্টভুজা। ইনি সৌম্যমূর্তি, নয়নমনোহর এবং নানা অলংকারে ভূষিতা। ইঁহার মূলমুখ শুক্ল, দক্ষিণ মুখ পীতবর্ণ এবং বাম মুখ কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ। চারিটি দক্ষিণ ভুজে বিশ্ববজ্র, পদোপরি বুদ্ধ, বাণ এবং বরদমুদ্রা ধারণ করেন। চারিটি বামভুজে ধনু, পাশযুক্ত তর্জনী, অভয়মুদ্রা ও পূর্ণকুম্ভ ধারণ করেন। মস্তকে একটি ক্ষুদ্র বৈরোচন-মূর্তি দেখা যায়।

কলকাতার জাদুঘরে ইঁহার একটি সুন্দর মূর্তি আছে।

সিতাতপত্রা অপরাজিতা॥ সিতাতপত্রার গায়ের রং সাদা এবং ইনি ত্রিমুখা ও ষড়্ভুজা। ইঁহার মূল মুখ শুক্ল, দক্ষিণ নীল ও বাম রক্তবর্ণ। তিনটি দক্ষিণ হস্তে দেবী চক্র, অঙ্কুশ ও ধনু ধারণ করেন এবং তিনটি বাম হস্তে শ্বেত বর্ণের বজ্র, শর এবং পাশযুক্ত তর্জনী ধারণ করিয়া থাকেন। দেবী সৌম্যমূর্তি, দিব্যালংকারভূষণা এবং বৈরোচন-মুকুটা।

মহাসহাস্রপ্রমর্দিনী॥ এই দেবী পঞ্চ মহারক্ষাদেবীদের অন্যতমা। ইনি শুক্লবর্ণা, একমুখী এবং ষড়্ভুজা। দক্ষিণ ভুজত্রয়ে ইঁহার খড়্গ, বাণ ও বরদমুদ্রা থাকে, বাম ভুজত্রয়ে ধনু, পাশ ও পরশু থাকে। ইনি সৌম্যমূর্তি এবং বিচিত্র বসন-ভূষণে অলংকৃতা থাকেন। ইনিও বৈরোচনবিরোধী।

বজ্রবারাহী॥ বৈরোচনকুলের দেবী বজ্রবারাহী তান্ত্রিকদের এক অতি প্রিয় দেবতা। ইঁহার পূজা ও সাধনার জন্য পৃথক তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। তন্ত্রগ্রন্থে বজ্রবারাহীকে শ্রীহেরুক দেবের অগ্রমহিষী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বজ্রবারাহীর গায়ের রং লাল এবং ইনি দিগ্‌বসনা, একমুখা এবং দ্বিভুজা। ইনি একটি শবের উপর অর্ধপর্যাঙ্কাসনে নৃত্য করিতে থাকেন। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত কর্ত্রি থাকে এবং বামে হৃৎপ্রদেশে রক্ত পরিপূরিত কপাল থাকে। ইঁহার স্কন্ধ হইতে একটি ভীষণাকৃতি খট্বাঙ্গ প্রলম্বিত হইয়া থাকে। দেবীর মূর্তি ও মুখমণ্ডল ভয়প্রদ ও ক্রোধব্যঞ্জক। মাথার পার্শ্বদেশ হইতে একটি বরাহমুখ বহির্গত হয়। এই বিকৃতির জন্যই দেবীর নাম বজ্রবারাহী হইয়াছে। এই দেবীর অনেক সুন্দর সুন্দর ও নানা প্রকারের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালে ও তিব্বতে বজ্রবারাহী খুব জনপ্রিয়।

চুন্দা॥ বজ্রযানীদের কতকগুলি বড়ো মন্ত্র আছে, সেইগুলিকে ধারণী

বা ধারিণী নামে অভিহিত করা হয়। বোধ হয়, এইগুলি মুখস্থ বা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে হইত বলিয়া উহাদের নাম ধারিণী হইয়াছিল। এই ধারিণীগুলির ভিতর একটির নাম চুন্দাধারিণী। এই ধারিণী পুস্তকটিকে রূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। সেই চুন্দাধারিণী পুস্তকই চুন্দাদেবী। চুন্দার সম্বন্ধে নানা কথা বলা যায় এবং ইঁহার নানাপ্রকার মূর্তিরও কথা বলা যায়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার স্থান নাই। তাই তাঁহার একটি সাধারণ মূর্তির কথাই এখানে দেওয়া হইল।

চুন্দার গায়ের রং শরৎচন্দ্রের ন্যায় শুভ্র ও নির্মল। ইনি একমুখা ও চতুর্ভুজা এবং নানা বস্ত্রাভরণে ভূষিতা। ইঁহার মস্তকে কখনও কখনও বজ্রসত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি দেখা যায়। বজ্রসত্ত্বের কোনো কুল নাই, সেইজন্য বজ্রসত্ত্ব এখানে বৈরোচনকুলের অন্তর্বর্তী। চুন্দাদেবী একটি দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং একটি বাম হস্তে পুস্তকাঙ্কিত পদ্ম ধারণ করেন। শেষ ভুজদ্বয়ে ক্রোড়ের উপর পাত্র ধারণ করেন। চুন্দার এইরূপ একটি ধাতুমূর্তি আমেরিকার ফ্রিয়ার গ্যালারিতে রক্ষিত আছে। ষোড়শভুজা চুন্দার ধাতু ও প্রস্তর মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রহমাতৃকা॥ গ্রহমাতৃকা ত্রিমুখা ও শ্বেতবর্ণ বিশিষ্টা। তাঁহার মূল মুখ শুভ্র, দক্ষিণ পীত এবং বাম রক্তবর্ণ। তাঁহার হাত ছয়টি। মূল ভুজদ্বয়ে ধর্মচক্র-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। দুইটি অপর দক্ষিণ হস্তে বজ্র এবং শর ধারণ করেন। বাকি দুইটি বামহস্তে কমল ও ধনু ধারণ করেন। দেবী সহস্রদল-পদ্মের উপর বজ্রাসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন থাকেন।

নবম অধ্যায়

রত্নসম্ভবকুল

রত্নসম্ভবকুলের প্রবর্তক ধ্যানীবুদ্ধ রত্নসম্ভব। রত্নসম্ভবের অর্থ যিনি রত্ন নামে অভিহিত সকল বিষয়বস্তুর উৎপত্তিস্থল। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে, রত্নসম্ভব জগৎকারণ পরাশূন্যেরই একটি গুণ প্রকাশ করিতেছেন। বরদমুদ্রাধারী পীতবর্ণের এই ধ্যানীবুদ্ধ শূন্যের রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নহেন। ইঁহার পীতবর্ণ পৃথ্বীতত্ত্বের দ্যোতক। ইঁহার শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরী। ইঁহাদের কুলের নাম রত্নকুল। সাধারণত রত্নসম্ভবকুলের সন্ততিগণের বর্ণ পীত বা হলুদ, যদিও এই নিয়ম সকল সময়ে প্রযোজ্য নহে। রত্নসম্ভব পঞ্চস্কন্ধের ভিতর বেদনা নামক স্কন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইনি সমস্ত দক্ষিণ দিশার উপর আধিপত্য করেন এবং মণ্ডলস্থ যত দেবতা দক্ষিণ দিকে অবস্থান করেন তাঁহাদের সকলেরই কুলেশ রত্নসম্ভব। রত্নচ্ছটা এই কুলের প্রতীকচিহ্ন। রত্নসম্ভব বসন্তঋতু, লবণ-রস এবং বর্ণমালার ত-বর্গ অক্ষরের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। গুহ্যসমাজ হইতে জানা যায় যে, তিনি 'রত্নধৃক' মন্ত্রপদের স্পন্দন হইতে ঘন, ঘনতর ও ঘনতম হইয়া দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিও 'ঈর্ষ্যারতি' মন্ত্রপদের তরঙ্গ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। রত্নসম্ভবকুলের আর-একটি নাম চিন্তামণিকুল। শস্য, ধন, রত্নাদি পৃথ্বিতত্ত্বের অন্তর্গত বলিয়া এই কুলের বর্ণ পীত।

এই কুলের দেবতার সংখ্যা বিশেষ বেশি নহে। পুরুষ-দেবতা অপেক্ষা স্ত্রী-দেবতারই আধিক্য এই কুলে দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেবতাই

মস্তকের উপর বরদ-মুদ্রাধারী রত্নসম্ভবের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি ধারণ করিয়া স্বকুলের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই কুলের সন্ততিদের সংক্ষিপ্ত রূপকল্পনা নিম্নে দেওয়া হইল।

জম্ভল॥ অক্ষোভ্যের সন্ততিরূপে জম্ভলের বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জম্ভল ধনরত্নাদির দেবতা বলিয়া রত্নসম্ভবের সন্ততিরূপে পরিগণিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ সম্বন্ধে দুই মত প্রচলিত আছে। অক্ষোভ্য কুলের মূর্তি এ কুলের মূর্তি হইতে বিভিন্ন। রত্নসম্ভবের সন্ততিরূপে জম্ভল পীতবর্ণ, দ্বিভুজ এবং পদ্মোপরি ললিতাসনে উপবিষ্ট থাকেন। দক্ষিণ হস্তে বীজপূরক এবং বাম হস্তে নানা রত্নোদ্‌গারী নকুল ধারণ করেন। নিকটে নানা ধনরত্ন-পরিপূরিত ঘট-কলশাদি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পেট একটু মোটা, গাত্রে নানা প্রকার অলংকার এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ ক্রোধাবিষ্ট। ইনি কখনও কখনও শক্তি বসুধারার সহিত আলিঙ্গানবদ্ধ থাকেন। জম্ভলের আরও মূর্তি আছে, কিন্তু তাহা স্থানাভাবে দেওয়া গেল না।

উচ্ছুষ্মজম্ভল॥ এই ধনরত্নাদির দেবতার বিবরণ একবার পূর্বে অক্ষোভ্য-প্রকরণে দেওয়া হইয়াছে। এখানে রত্নসম্ভবের সন্ততি হিসাবে আবার দেওয়া হইল। দুই মূর্তিতে কোনো পার্থক্য নাই। কেবল এখানে রত্নসম্ভবের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি দেবতার মাথায় থাকা উচিত।

বজ্রতারা॥ বজ্রতারার মূর্তি নানা রকমের পাওয়া যায়। তাঁহার মূর্তির বাহুল্য দেখিয়া মনে হয় বজ্রতারা শক্তিশালী দেবী ছিলেন এবং তাঁহার মূর্তি, মন্ত্র, উপাসনা আদি সমাজের নানা কাজে ব্যবহৃত হইত। তাই তান্ত্রিকদের ভিতর তিনি জনপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বজ্রতারার একটি পূর্ণমণ্ডলের বিবরণ নিষ্পন্নযোগাবলীতে পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে

তাঁহার সমস্ত পরিবার-দেবতা বা আবরণ-দেবতার খবর পাওয়া যায়।

বজ্রতারার শরীরের বর্ণ পীত এবং তিনি বজ্রপর্যাঙ্কাসনে ধ্যানমগ্ন থাকেন। দেবী রূপলাবণ্যবতী, নবযৌবনোদ্ভিন্না এবং সর্বালংকারভূষিতা। তিনি চতুর্মুখা ও অষ্টভুজা এবং দশদেবী-পরিবৃতা। তাঁহার মন্ত্র 'ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা' দশাক্ষর। এই দশ অক্ষরের প্রত্যেকটি অক্ষর হইতে একটি একটি দেবীর উৎপত্তি হয়।

বজ্রতারা চারিটি দক্ষিণ ভুজে বজ্র, পাশ, শঙ্খ ও শর ধারণ করেন। এবং চারিটি বাম ভুজে বজ্রাঙ্কিত অঙ্কুশ, উৎপল, ধনু এবং তর্জনী প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

বজ্রতারার চারি মুখ্য দিশায় চারিটি দেবী থাকেন। পূর্বে পুষ্পতারা, দক্ষিণে ধূপতারা, পশ্চিমে দীপতারা এবং উত্তরে গন্ধতারা অবস্থান করেন।

চতুর্দিকে চারিটি দ্বারে চারিজন দ্বার-দেবী থাকেন। পূর্ব দ্বারে বজ্রাঙ্কুশী, দক্ষিণ দ্বারে বজ্রপাশী, পশ্চিম দ্বারে বজ্রস্ফোটী এবং উত্তর দ্বারে বজ্রঘণ্টা অবস্থান করেন।

উর্ধ্বে উষ্ণীষবিজয়া এবং নিম্নে সুম্ভা অবস্থান করেন।

এই দশদেবী যে কেবল বজ্রতারা-মণ্ডলেই থাকেন তাহা নহে, অপরাপর দেবদেবীর মণ্ডলেও ইঁহাদের দেখা যায়। পরে আরও কিছু এ সম্বন্ধে বলা হইবে।

বসুধারা ॥ বসুধারা রত্নসম্ভবকুলেরও একজন দেবী। কেহ কেহ ইঁহাকে জম্ভলের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষোভ্যকুলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে বসুধারা ধনরত্ন ধান্য শস্যাদির দেবতা বলিয়া তাঁহাকে রত্নকুলের অন্তর্গত করাই স্বাভাবিক। রত্নকুলের বসুধারা পীতবর্ণ একমুখা ও দ্বিভুজা। দক্ষিণ হস্তে দেবী বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বাম হস্তে পাত্রোপরি ধান্যের শিষ

ধারণ করিয়া থাকেন। মস্তকোপরি রত্নসম্ভবের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি ধারণ করিয়া স্বকুলের পরিচয় প্রদান করেন। নেপালে একমুখা ও ষড়্‌ভুজা বসুধারার ধাতুমূর্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই মূর্তির কোনো ধ্যান বা রূপ কল্পনা নজরে পড়ে নাই।

মহাপ্রতিসরা ॥ রত্নকুলের এই দেবী পঞ্চমহারক্ষার অন্যতমা। পঞ্চরক্ষা দেবীদের বিবৃতিকালে আবার এই চর্চা করা হইবে। মহাপ্রতিসরা পীতবর্ণা, ত্রিমুখা এবং দশভুজা। পাঁচটি দক্ষিণভুজে যথাক্রমে খড়্গ, বজ্র, বাণ, বরদমুদ্রা ও হৃৎপ্রদেশে ছত্র প্রদর্শন করেন। সেইরূপে পাঁচটি বাম ভুজে ধনু, ধ্বজা, রত্নচ্ছটা, পরশু এবং শঙ্খ ধারণ করেন। মস্তকোপরি রত্নসম্ভবের ক্ষুদ্র মূর্তি ধারণ করিয়া স্বকুলের পরিচয় দেন। অর্ধপর্যাঙ্ক ললিতপদে বসিয়া থাকেন এবং দিব্য আভরণ ও বস্ত্রাদিতে ভূষিত থাকেন।

অপরাজিতা ॥ রত্নসম্ভবকুলের দেবতা অপরাজিতা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। প্রথমত ইনি হিন্দু দেবতা গণপতিকে পদদলিত করিয়া থাকেন এবং ইঁহার মুদ্রাকে চপেট-দান মুদ্রা নামে অভিহিত করা হয়। অপরাজিতার প্রস্তরমূর্তিতে হাত তুলিয়া ঠিক যেরূপে লোকে চপেট বা চড় মারে সেইরূপে দেবীর হস্ত বিন্যস্ত থাকে। ইনি পীতবর্ণা, দ্বিভুজা, একমুখী, নানা রত্নোপশোভিতা, দক্ষিণে চপেট-দান অভিনয় করেন এবং বামে পাশযুক্ত তর্জনী প্রদর্শন করেন। ইঁহার মুখ অতি ভয়ংকর, করাল ও রৌদ্র। ব্রহ্মাদি দুষ্ট দেবতারা দেবীর মাথায় ছত্র ধরিয়া থাকেন।

বজ্রযোগিনী ॥ রত্নসম্ভবকুলের এই দেবী অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয়। ইঁহার মন্ত্র একটি সিদ্ধমন্ত্র। এক লক্ষ জপ করিলে দেবী সিদ্ধ হন এবং সাধকের সম্মুখে আবির্ভূত হন। ইঁহাকে দেখিতে ঠিক হিন্দু দেবী ছিন্নমস্তার মতো। বোধ হয় বৌদ্ধ বজ্রযোগিনী হিন্দু ছিন্নমস্তাতে পরিণত হইয়াছিলেন

এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণও আছে। ধ্যান হইতে দেখা যায়, বজ্রযোগিনী পীতবর্ণা ও নগ্না। তিনি স্বয়ং নিজ মস্তক দক্ষিণ হস্তধৃত কর্ত্রি দ্বারা কর্তিত করিয়া, বাম হস্তে বক্ষের নিকট ধারণ করেন। তাঁহার দক্ষিণ পদ প্রসারিত এবং বাম পদ সঙ্কুচিত, কবন্ধ হইতে নিঃসৃত একটি অসৃক্ ধারা তাঁহার কর্তিত মুখে প্রবেশ করে। অপর দুইটি রক্তধারা দুই পার্শ্বে অবস্থিত দুইটি যোগিনীর মুখে প্রবেশ করে। এই দুইটি যোগিনীর নাম বজ্রবর্ণনী শ্যামবর্ণা ও বজ্রবৈরোচনী পীতবর্ণা। তাঁহাদের দক্ষিণ হস্তে ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত কর্ত্রি থাকে এবং বামে কপাল হৃৎপ্রদেশে রক্ষিত থাকে।

বজ্রযোগিনীর নামে পৃথক তন্ত্র লিখিত হইয়াছিল এবং তাঁহার নানারূপ মূর্তিও কল্পিত হইয়াছিল। সে সমস্ত কথা বলিতে গেলে গ্রন্থ ভারী হইয়া যাইবার ভয়ে বিরত হইতে হইল। বজ্রযোগিনীর মন্ত্র এইপ্রকার—'ওঁ সর্ববুদ্ধডাকিনীয়ে ওঁ বজ্রবর্ণনীয়ে ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ হুঁ ফট ফট ফট স্বাহা।' এটি সিদ্ধমন্ত্র।

প্রসন্নতারা॥ পীতবর্ণের প্রসন্নতারা দেখিতে অতি ভয়ংকর। তাঁহার বদনমণ্ডল ক্রোধোদ্ভাসিত, অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার পিঙ্গল কেশরাজি মস্তকের উপর উত্থিত হয়। তিনি অষ্টমুখা ও ষোড়শভুজা। আটটি দক্ষিণ হস্তে খট্বাঙ্গ, উৎপল, বাণ, বজ্র, অঙ্কুশ, মুদ্গর, কর্ত্রি এবং অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করেন। আটটি বাম হস্তে পাশযুক্ত তর্জনী, কপাল, ধনু, খট্বাঙ্গ, বজ্র, পাশ, ব্রহ্মমুণ্ড এবং রত্নপূরিত ঘট ধারণ করিয়া থাকেন। দেবী প্রত্যালীঢ় পদে দাঁড়াইয়া বাম পদে ইন্দ্রকে এবং দক্ষিণ পদ দ্বারা উপেন্দ্রকে দলিত করেন এবং দুই পদের মধ্যে রুদ্র, ব্রহ্মা ও অপরাপর মারগণকে নিষ্পেষিত করিয়া থাকেন। ইঁহার মূর্তি অতীব দুষ্প্রাপ্য।

দশম অধ্যায়

অমোঘসিদ্ধিকুল

ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধি এই কুলের প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত। যাঁহার সিদ্ধি অমোঘ বা অব্যর্থ, অর্থাৎ যাহার কোনো কার্য অসিদ্ধ নহে, কোনো কার্য নিষ্ফল হয় না, তিনিই অমোঘসিদ্ধি। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয যে অমোঘসিদ্ধি পরাশূন্যেরই একটি গুণবিশেষ এবং এই গুণকে রূপদান করিয়া ধ্যানীবুদ্ধরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইঁহার বর্ণ সবুজ এবং ইঁহাব শক্তির নাম তারা, তারিণী বা আর্যতারা। ইঁহাদের কুলের নাম কর্মকুল এবং বিশ্ববজ্র এই কুলের প্রতীক চিহ্ন। সাধারণত এই কুলের সন্ততিগণ হরিদ্বর্ণ শরীর ধারণ করেন যদিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম বেশ দেখা যায়।

অমোঘসিদ্ধি পঞ্চস্কন্ধের ভিতর সংস্কারস্কন্ধের অধিষ্ঠাতা এবং ইনি সমস্ত উত্তরদিশার উপর আধিপত্য করেন। মণ্ডলের উত্তরদিগ্‌ভাগে যত দেবতা থাকেন তাঁহারা সকলেই অমোঘসিদ্ধির সন্ততি বলিয়া গণ্য হন। এই ধ্যানীবুদ্ধ বর্ষা ঋতু, তিক্ত রসাত্মক সমস্ত দ্রব্য, বর্ণমালার 'প' বর্গের অক্ষরগুলির এবং অর্ধরাত্রির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন। গুহ্যসমাজ তন্ত্র হইতে জানা যায় যে তিনি 'প্রজ্ঞাধৃক্' এই বজ্রপদের স্পন্দন হইতে ঘন, ঘনতর ও ঘনতম হইয়া দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিও 'বজ্ররতি' এই মন্ত্র পদ হইতে ঘনীভূত হইয়া প্রকট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কুলের আর একটি নাম সময়কুল। ইঁহারা বায়ুতত্ত্বের দেবতা বলিয়া ইঁহাদের বর্ণ হরিৎ।

এই কুলের সন্ততিসংখ্যা বেশি না হইলেও নেহাত কমও নয়। একজন পুরুষদেবতা এবং অনেকগুলি স্ত্রীদেবতা এই কুলের অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাদের

বর্ণ প্রায়ই সবুজ এবং ইঁহারা একটি ক্ষুদ্র অভয় মুদ্রাযুক্ত অমোঘসিদ্ধির মূর্তি মস্তক বা মুকুটের উপর ধারণ করেন। এই সন্ততি সম্প্রদায়ের রূপ কল্পনা এক এক করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল।

বজ্রামৃত॥ অমোঘসিদ্ধিকুলের এই দেবতার বিবরণ নিষ্পন্ন-যোগাবলীর বজ্রামৃত-মণ্ডলে পাওয়া যায়। সেইস্থানে প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় এই পুরুষ দেবতার বর্ণ হরিৎ, ইনি নরবাহন, ত্রিমুখ এবং ষড়্ভুজ। ইঁহার মূলমুখ হরিদ্বর্ণ, দক্ষিণ শুক্ল এবং বাম রক্তবর্ণ। দুইটি মূলহস্তে বজ্র ও ঘণ্টা ধারণ করিয়া তিনি স্বাভা প্রজ্ঞাকে আলিঙ্গান করেন। অপর দুইটি দক্ষিণ হস্তে চক্র এবং অসি ধারণ করেন এবং অপর বাম হস্তদ্বয়ে পাশ এবং অঙ্কুশ ধারণ করেন। ইঁহার শক্তির বর্ণভুজাদি ঠিক মূল দেবতার মতো।

খদিরবনী-তারা॥ অমোঘসিদ্ধিকুলের এই স্ত্রীদেবতার ধাতু ও প্রস্তরমূর্তি সকল বৌদ্ধ দেশেই বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, ভারতেও ইঁহার প্রস্তরমূর্তি কম নহে। ইঁহার গায়ের রং সবুজ এবং ইনি একমুখা এবং দ্বিভুজা। দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বামহস্তে উৎপল ধারণ করেন। তিনি কোনো মূর্তিতে দাঁড়াইয়া থাকেন, কোনো মূর্তিতে বজ্রাসনে আবার কোনো মূর্তিতে ললিতাসনে বসিয়া থাকেন। ইঁহার সঙ্গে থাকে আরও দুইটি দেবতা। দক্ষিণে থাকেন অশোককান্তা-মারীচী এবং বামে থাকেন একজটা।

মহাশ্রীতারা॥ অমোঘসিদ্ধিকুলের এই দেবী অত্যন্ত সৌম্য-দর্শনা, এবং করুণাপরায়ণা। ইঁহার গায়ের রং হরিদ্বর্ণ এবং ইনি এক মুখা ও দ্বিভুজা। হস্তদ্বয়ে বাখ্যান বা ধর্মচক্রমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দুই পার্শ্বে দুইটি উৎপল শোভা পায়। সুবর্ণ সিংহাসনে নানা পুষ্পরাজিনির্মিত গদির উপর মহারাজ

লীলাসনে বসিয়া থাকেন। তাঁহার মস্তকের উপর অভয়মুদ্রা যুক্ত অমোঘসিদ্ধির একটি ক্ষুদ্রমূর্তি শোভা পায়। দেবীর সহিত চারিটি আবরণ দেবতা থাকে। মূল দেবতার বামে থাকেন একজটা এবং আর্য-জাঙ্গুলী এবং দক্ষিণে থাকেন অশোককান্তা এবং মহামায়ুরী।

একজটা অর্ধপর্যঙ্কে উপবিষ্ট, নীলবর্ণ, দুই হস্তে কর্ত্রি ও কপালধারী। তিনি ভীষণদর্শনা ক্রোধ মূর্তি। অশোককান্তা পীতবর্ণা, রত্নমুকুটী, দুই হস্তে বজ্র ও অশোকপল্লব ধারণ করেন। আর্যজাঙ্গুলী শ্যামবর্ণ। দুই হস্তে সর্প ও বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন। মহামায়ুরী দুই হাতে ময়ূরপিচ্ছ এবং বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন।

চতুর্বেদী পরিবৃত মহাশ্রীতারার একটি সুন্দর মূর্তি কলকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ইঁহার মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে ধনপ্রাপ্তির জন্য ইঁহার উপাসনা করা হইত।

বশ্যতারা॥ বশ্যতারা ও খদিরবনীর মূর্তি কল্পনায় বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যায় না, তবে বশ্যতারার কোনো আবরণ দেবতা থাকে না এবং তিনি একটি বিশিষ্ট আসনে বসিয়া থাকেন। ইহাকে বলে ভদ্রাসন। উচ্চ পীঠ হইতে দুই পা ঝুলাইয়া বিলাতি ধরনে বসার নামই ভদ্রাসন। তাহা ছাড়া আর কোনো ভেদ নাই। ইনিও খদিরবনীর মতো শ্যামবর্ণ, একমুখ, দ্বিভুজ এবং অমোঘসিদ্ধি মুদ্রিত। এক হাতে বরদমুদ্রা ও অপর হাতে উৎপল ধারণ করিয়া থাকেন।

ষড়্ভুজ-সিততারা॥ এই দেবীর রং সাদা, মুখ তিনটি এবং হাত ছয়টি। ইনি পদ্মের উপর অর্ধপর্যঙ্কে বসিয়া থাকেন এবং ইঁহার জটামুকুটে অমোঘসিদ্ধি বিরাজ করেন। ইঁহার মূল মুখ শ্বেত, দক্ষিণ পীত এবং বাম নীল। দক্ষিণ ত্রিকরে বরদমুদ্রা, অক্ষসূত্র ও শর ধারণ করেন এবং বাম

ত্রিকরে উৎপল্, পদ্ম ও ধনু ধারণ করেন। দেবী নব-যৌবনশালিনী এবং দ্বিরষ্টবর্ষাকৃতি। এস্থলে উৎপল বলিতে রাত্রির পদ্ম এবং পদ্ম বলিতে দিনের পদ্ম বুঝায়। উৎপলের কোরক অর্ধস্ফুটিত, পদ্মের কোরক সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত ও প্রসারিত।

ধনদ-তারা॥ এই দেবী একমুখা ও চতুর্ভুজা। চারিটি হস্তে অক্ষসূত্র, বরদমুদ্রা, উৎপল ও পুস্তক ধারণ করিয়া থাকেন। দেবী হরিদ্বর্ণা, সৌম্যা এবং সত্ত্বপর্যঙ্কা বা নরবাহনা।

সিততারা॥ এই দেবী চতুর্ভুজা, শুক্লবর্ণা ও সৌম্যদর্শনা। মূল হস্তদ্বয়ে উৎপল মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় হস্তদ্বয়ে অক্ষসূত্র ও বরদমুদ্রা ধারণ করেন। তাঁহার সঙ্গে মহামায়ূরী এবং মারীচী থাকেন।

পর্ণশবরী॥ অক্ষোভ্যের সন্ততিরূপে পর্ণশবরীর বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। অমোঘসিদ্ধির সন্ততিরূপে তাঁহার আর-একটি রূপ আছে। যদিও দুইটি রূপের ভিতর পার্থক্য বড়ো বেশি নাই। অমোঘ সিদ্ধিকূলে পর্ণশবরী হরিদ্বর্ণা এবং অভয় মুদ্রাযুক্ত অমোঘসিদ্ধি ধ্যানিবুদ্ধের মূর্তি মস্তকোপরি ধারণ করেন। শরীরের বর্ণ শ্যাম বা হরিৎ হওয়ায় তাঁহার মূল মুখ হরিদ্বর্ণ, দক্ষিণ মুখ কৃষ্ণবর্ণ এবং বামমুখ শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। তাঁহার হাতের অস্ত্রশস্ত্রগুলি পূর্ববৎ ছয়টি হাতে বিরাজ করে। এখানেও পর্ণশবরী সর্বমারি প্রশমনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পর্ণশবরীর একটি বড়ো মন্ত্র ধারণী-রূপে পাওয়া যায়।

মহামায়ূরী ॥ পঞ্চরক্ষা দেবীদের মধ্যে মহামায়ূরী অন্যতমা। ইনি হরিদ্বর্ণা ও অমোঘসিদ্ধি সম্ভূতা। ইঁহার তিন মুখ ও ছয়টি হাত। মূল মুখ হরিদ্বর্ণ, দক্ষিণ কৃষ্ণবর্ণ এবং বাম মুখ শুক্লবর্ণ। তিনটি দক্ষিণ হস্তে দেবী ময়ূরপিচ্ছ, বাণ ও বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বাম ত্রিভুজে রত্নচ্ছটা

ধনু ও ক্রোড়ের উপর কলশ ধারণ করেন। দেবী সৌম্যদর্শনা এবং মুকুটে অমোঘসিদ্ধি মুদ্রিতা।

বজ্রশৃঙ্খলা॥ বজ্রশৃঙ্খলা হরিদ্বর্ণা ও অমোঘসিদ্ধি সম্ভূতা। ইঁহার মুখ তিনটি এবং হাত আটটি। ইনি ললিতাসনে পদ্মোপরি বসিয়া থাকেন। ইঁহার মূল মুখ হরিদ্বর্ণ, দক্ষিণ মুখ কপিলবর্ণ এবং বামমুখ রক্তবর্ণ। দক্ষিণ করচতুষ্টয়ে অভয়মুদ্রা, বজ্র, বজ্রশৃঙ্খলা ও শর ধারণ করেন। বাম করচতুষ্টয়ে দেবী রক্তপূর্ণ কপাল, তর্জনী, পাশ ও ধনু ধারণ করেন। অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্ধ্বে উত্থিত কেশরাজিব উপর একটি ক্ষুদ্র অমোঘসিদ্ধির মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর উত্তরীয় মার্জারচর্মে নির্মিত। শৃঙ্খলা এই দেবীর পরিচয় চিহ্ন।

বজ্রগান্ধারী॥ বজ্রগান্ধারী কৃষ্ণবর্ণা, ষণ্মুখা, দ্বাদশভুজা, ভয়ংকর দর্শনা। ইনি প্রত্যালীঢ়পদা, দংষ্ট্রা করাল বদনা, ঊর্ধ্ব পিঙ্গল কেশী। ছয়টি দক্ষিণ করে বজ্র, বজ্রঘণ্টা, খড়্গ, ত্রিশূল, বাণ ও চক্র ধারণ করেন। ছয়টি বামহস্তে দেবী খট্টাঙ্গ, অঙ্কুশ, ধনু, পরশু, পাশ এবং হৃৎপ্রদেশে তর্জনী ধারণ করেন। ইঁহাকে ভীষ্ম-ভগিনী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই দেবীর একটি ধারণী পাওয়া গিয়াছে।

একাদশ অধ্যায়

সমজাতীয় দেবতা

বজ্রযান বৌদ্ধধর্মে যত দেবতা আছেন তাঁহাদের সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি একক থাকেন, আবার কতকগুলি সর্বদাই দলবদ্ধ হইয়া আবির্ভূত হন। তন্ত্রের পুথি অধ্যয়ন করিলে এই দুই প্রকারের দেবতা সাধনায় এবং মণ্ডলে সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। একক দেব দেবীদের মূর্তিগুলি পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এখন যে সকল দেবতা দলবদ্ধ হইয়া বা শ্রেণিবদ্ধ হইয়া মণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হন, তাঁহাদেরই বিবরণ এখানে দেওয়া হইবে। ইঁহারা সকলেই সমজাতীয়। গুণে, কর্মে এবং পদ মর্যাদায় কোনো পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। এক জাতীয় দেবতাদের ভিতর আবার তিন প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়, কতকগুলি পরিবার দেবতার সমষ্টি, কতকগুলি আবরণ দেবতার সমষ্টি এবং কতকগুলি অবান্তর দেবতাদের সমষ্টি। পঞ্চ মহারক্ষা দেবীরা আবরণ দেবতা, অষ্ট গৌর্যাদি দেবতা পরিবার দেবতা এবং দশ দিগ্‌দেবতা অবান্তর দেবতাদের সমষ্টি। এগুলির এক সঙ্গে বিবরণ না দেওয়া হইলে ইহাদের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হওয়া শক্ত। সমজাতীয় দেবতাদের বিবরণ একটি একটি শ্রেণিতে বা সমষ্টিতে নিম্নে দেওয়া হইল।

ক. দশ দিগ্‌দেবতা

চারিটি মূল দিশা, চারিটি কোণ, ঊর্ধ্ব এবং অধঃ লইয়া দশটি দিশা প্রত্যেক মণ্ডলে থাকে। প্রত্যেক দিশায় একটি করিয়া দিক্‌পাল থাকেন। ইঁহাদের ভিতর কেহ কেহ অজ্ঞাত, অপর কোনো কোনোটি বিশেষ জনপ্রিয়। যেগুলি জনপ্রিয় ও শক্তিশালী বলিয়া পরিগণিত হন, তাঁহাদের একক

মূর্তিও পৃথক মণ্ডলে পূজিত হইয়া থাকে। দশজনের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

যমান্তক ॥ যমান্তক বা যমারির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পূর্ব দিকের দিক্‌পালরূপে তাঁহার রং নীল। তাঁহার তিন মুখ তিন রঙের—নীল, সাদা ও লাল। তাঁহার ছয় হাত ; দুইটি মূল হস্তে প্রজ্ঞাকে আলিঙ্গন করেন, বাকি চারিটি হস্তে বজ্রাঙ্কিত দণ্ড, অসি, রত্ন এবং পদ্ম ধারণ করেন। তাঁহার অপর নাম বজ্রদণ্ড।

প্রজ্ঞান্তক ॥ দক্ষিণ দিশার অধিপতি প্রজ্ঞান্তক শ্বেতবর্ণের। ইঁহার মুখ তিনটি সাদা, নীল এবং লাল বর্ণের। ইঁহার ছয় হাত, দুইটি মূল হাতে তিনি শক্তিকে ধরিয়া থাকেন এবং বাকি চারিটি হাতে বজ্রাঙ্কিত শ্বেতদণ্ড, অসি, রত্ন এবং পদ্ম ধারণ করেন। তাঁহার আর-একটি নাম বজ্রকুণ্ডলী।

পদ্মান্তক ॥ পশ্চিম দিশার দিক্‌পাল পদ্মান্তক ত্রিমুখ, ষড়্‌ভুজ এবং রক্তবর্ণ। তাঁহার তিন মুখ যথাক্রমে রক্ত, নীল এবং শুভ্র বর্ণের। দুই মূল হস্তে তিনি শক্তিকে আলিঙ্গন করেন এবং বাকি চারিটি হস্তে রক্তপদ্ম, অসি, রত্ন এবং চক্র ধারণ করেন। ইঁহার আর একটি নাম বজ্রোষ্ণীষ।

বিঘ্নান্তক ॥ উত্তর দিশার দিক্‌পাল বিঘ্নান্তক ত্রিমুখ, ষড়্‌ভুজ এবং হরিদ্বর্ণের। তাঁহার তিনমুখের রং যথাক্রমে হরিৎ, শ্বেত এবং রক্ত। দুইটি মূল হাতে শক্তিকে ধরিয়া থাকেন এবং বাকি চারিটি হাতে বজ্র, অসি, রত্ন এবং পদ্ম ধারণ করেন। ইঁহার আর একটি নাম অনলার্ক। ইঁহার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

টক্কিরাজ ॥ অগ্নিকোণের দেবতা টক্কিরাজ ত্রিমুখ, ষড়্‌ভুজ এবং নীলবর্ণ বিশিষ্ট। তিনটি মুখের রং যথাক্রমে নীল, শুভ্র এবং রক্ত। দুইটি মূল হস্তে তিনি শক্তিকে ধরিয়া থাকেন। বাকি চারিটি হস্তে অঙ্কুশ, অসি, রত্ন এবং

পদ্ম ধারণ করেন। তাঁহার অপর দুইটি নাম বজ্রযক্ষ এবং বজ্রজ্বালানলার্ক।

নীলদণ্ড ॥ নৈর্ঋত কোণের দেবতা নীলদণ্ড ত্রিমুখ, ষড়্‌ভুজ এবং নীল বর্ণ বিশিষ্ট। তাঁহার তিনটি মুখের রং যথাক্রমে নীল, শ্বেত এবং রক্ত বর্ণের। দুইটি প্রধান হস্তে তিনি শক্তিকে ধরিয়া থাকেন, অপর চারিটি হস্তে নীলদণ্ড, অসি, রত্ন ও পদ্ম ধারণ করেন। ইঁহার অপর দুইটি নাম বজ্রকাল এবং হেরুকবজ্র।

মহাবল ॥ বায়ুকোণের দেবতা মহাবল ত্রিমুখ ষড়্‌ভুজ এবং নীল বর্ণ বিশিষ্ট। তিনটি মুখের রং যথাক্রমে নীল, শ্বেত ও রক্ত। দুইটি প্রধান ভুজে শক্তিকে ধরিয়া থাকেন, বাকি চারিটি হাতে ত্রিশূল, অসি, মণি ও পদ্ম ধারণ করেন। তাঁহার অপর দুইটি নাম মহাকাল এবং পরমাশ্ব।

অচল ॥ ঈশান কোণের দেবতা অচল ত্রিমুখ, ষড়্‌ভুজ এবং নীলবর্ণ বিশিষ্ট। তিনটি মুখের রং যথাক্রমে নীল, শ্বেত ও রক্ত। দুইটি প্রধান ভুজে দেবতা শক্তিকে ধরিয়া থাকেন এবং বাকি চারিটি ভুজে অসি, বজ্র, মণি এবং পদ্ম ধারণ করেন। তাঁহার অপর দুইটি নাম বজ্রভীষণ এবং ত্রৈলোক্যবিজয়।

উষ্ণীষ ॥ ঊর্ধ্ব দিশার দেবতা উষ্ণীষ ত্রিমুখ, ষড়্‌ভুজ এবং পীতবর্ণ বিশিষ্ট। তিনটি মুখের রং যথাক্রমে পীত, নীল এবং রক্ত। ইনি দুইটি প্রধান ভুজে শক্তিকে ধরেন এবং অপর চারিটি হস্তে পীত চক্র, অসি, মণি ও পদ্ম ধারণ করেন। ইঁহাকে উষ্ণীষ-চক্রবর্তীও বলা হয়।

সুম্ভরাজ ॥ অধোদিশার দেবতা সুম্ভরাজ ত্রিমুখ, ষড়্‌ভুজ এবং নীল বর্ণবিশিষ্ট। তিনটি মুখ যথাক্রমে নীল, শ্বেত ও রক্তবর্ণের। দুইটি মূল ভুজে তিনি শক্তিকে ধরিয়া থাকেন এবং বাকি চারিটি ভুজে বজ্র, খড়্গ, মণি ও কমল ধারণ করেন। তাঁহার আর একটি নাম বজ্রপাতাল।

প্রায় সবগুলি দেবতার ধাতুমূর্তি মাঞ্চুরিয়ায় পাওয়া গিয়াছে।

খ. ছয় দিগ্‌দেবী

ঠিক যেমন দশটি দিক্‌পালের বিবরণ মণ্ডলে আছে, সেইরূপ ছয়টি দিগ্‌দেবীরও কথা বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। নিষ্পন্নযোগাবলীতে বজ্র তারা মণ্ডলে এই ছয়টি দিগ্‌দেবীর উল্লেখ আছে। এক এক করিয়া তাহাদের নাম ও রূপ নিম্নে দেওয়া হইল:

বজ্রাঙ্কুশী ॥ পূর্ব দিগ্-বিভাগের দেবতা বজ্রাঙ্কুশী একমুখা, দ্বিভুজা এবং শুক্লবর্ণা বিশিষ্টা। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বজ্রাঙ্কিত অঙ্কুশ ও বামহস্তে তর্জনী থাকে।

বজ্রপাশী ॥ দক্ষিণ দিগ্-বিভাগের দেবতা বজ্রপাশী একমুখা, দ্বিভুজা এবং পীতবর্ণ বিশিষ্টা। ইনি দক্ষিণ হস্তে বজ্রাঙ্কিত পাশ এবং বামহস্তে তর্জনী ধারণ করেন।

বজ্রস্ফোটা ॥ পশ্চিম দিগ্-বিভাগের দেবতা বজ্রস্ফোটা একমুখা, দ্বিভুজা, এবং রক্তবর্ণ বিশিষ্ট। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে বজ্রাঙ্কিত শৃঙ্খল এবং বামহস্তে তর্জনী থাকে। স্ফোট বলিতে শৃঙ্খল বুঝায়।

বজ্রঘণ্টা ॥ উত্তর দিগ্-বিভাগের দেবতা, বজ্রঘণ্টা একমুখা, দ্বিভুজা এবং হরিদ্বর্ণ বিশিষ্টা। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ঘণ্টা এবং বাম হস্তে তর্জনী থাকে।

উষ্ণীষবিজয়া ॥ ঊর্ধ্ব দিগ্-বিভাগের দেবতা উষ্ণীষ-বিজয়া এক মুখা, দ্বিভুজা এবং শুভ্রবর্ণ বিশিষ্টা। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে চক্র ও বামহস্তে তর্জনী থাকে।

সুম্ভা ॥ অধোদিগ্-বিভাগের দেবতা সুম্ভা একমুখা, দ্বিভুজা এবং নীলবর্ণ বিশিষ্টা। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে নাগনির্মিত পাশ এবং বামে তর্জনী থাকে।

এই ছয়টি দেবীর মূর্তি মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী পিকিং নগরে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের কুল রং অনুযায়ী ধার্য করিতে হয়। যে কুলের যে রং সেই রঙের কুলেশ সকল দেবীরই পক্ষে কল্পনীয়।

গ. অষ্ট উষ্ণীষদেবতা

বজ্রযানে উষ্ণীষ নামে একশ্রেণির দেবতা আছে। ইঁহারা দিগ্ দেবতাগণের অনুরূপ। ইঁহাদের ধাতুমূর্তি পিকিং শহরে পাওয়া গিয়াছে। সেইজন্য তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। নিষ্পন্নযোগাবলীর দুর্গতি পরিশোধন মণ্ডলে ইহাদের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। একে একে তাহাদের রূপ নিম্নে বিবৃত হইল :

বজ্রোষ্ণীষ ॥ পূর্বদিকের বজ্রোষ্ণীষ একমুখ, দ্বিভুজ এবং শুক্লবর্ণ বিশিষ্ট। ইনি ভূমিস্পর্শ মুদ্রা দক্ষিণ হস্তে প্রদর্শন করেন। বামহস্ত অক্ষোভ্যের ন্যায় উৎসঙ্গাস্থ হয়।

রত্নোষ্ণীষ ॥ দক্ষিণদিকে রত্নোষ্ণীষ একমুখ, দ্বিভুজ এবং নীল বর্ণ বিশিষ্ট। দক্ষিণহস্তে তিনি বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং বামহস্ত রত্ন-সম্ভবের ন্যায় উৎসঙ্গাস্থ হয়।

পদ্মোষ্ণীষ ॥ পশ্চিমদিকের পদ্মোষ্ণীষ একমুখ, দ্বিভুজ এবং রক্ত বর্ণবিশিষ্ট। ক্রোড়ের উপর তাঁহার দুই হাত সমাধিমুদ্রায় অমিতাভের ন্যায় মুদ্রাবদ্ধ থাকে।

বিশ্বোষ্ণীষ ॥ উত্তর দিকের বিশ্বোষ্ণীষ একমুখ, দ্বিভুজ এবং হরিদ্বর্ণ বিশিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অভয় মুদ্রা প্রদর্শন করে এবং বামহস্ত অমোঘসিদ্ধির ন্যায় উৎসঙ্গাস্থ হয়।

তেজোষ্ণীষ ॥ অগ্নিকোণের তেজোষ্ণীষ একমুখ, দ্বিভুজ এবং শ্বেতমিশ্রিত রক্তবর্ণ বিশিষ্ট। ইনি দক্ষিণহস্তে সূর্যমণ্ডল ধারণ করেন এবং

ইঁহার বামহস্ত কটিন্যস্ত থাকে।

ধ্বজোষ্ণীষ ॥ নৈর্ঋতকোণের ধ্বজোষ্ণীষ একমুখ, দ্বিভুজ এবং রক্তমিশ্রিত নীলবর্ণ বিশিষ্ট। তিনি দুই হস্তে চিন্তামণি যুক্ত পতাকা ধারণ করেন।

তীক্ষ্ণোষ্ণীষ ॥ বায়ুকোণের তীক্ষ্ণোষ্ণীষ একমুখ, দ্বিভুজ এবং নভঃ-শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট। তিনি দক্ষিণ হস্তে তরবারি এবং বামহস্তে পুস্তক ধারণ করেন।

ছত্রোষ্ণীষ ॥ ঈশান কোণের ছত্রোষ্ণীষ একমুখ, দ্বিভুজ এবং শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট। দুইহাতে একটি ছত্র উপরে তুলিয়া ধরেন।

ঘ. পঞ্চ রক্ষাদেবী

পঞ্চরক্ষা নামক বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থে পঞ্চরক্ষা দেবীদের উপাসনা, মন্ত্র তন্ত্রাদির উল্লেখ আছে। এই পঞ্চরক্ষা পুথি প্রায়শ সকল বৌদ্ধ গৃহস্থের বাড়িতেই পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের যেরূপ চণ্ডী, বৌদ্ধদের সেইরূপ পঞ্চরক্ষা। পাঁচজন রক্ষাকর্তা দেবী বৌদ্ধ গৃহস্থকে সকল বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। বিপদ, আপদ, অসুখ, বিসুখ, ঋণযোগ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, গ্রহাদির পীড়া হইতে রক্ষা করিতে এই দেবীরা অদ্বিতীয়। বিপদ আপদে এবং রোগাদিতে পঞ্চরক্ষা পুথি হইতে অংশবিশেষের পাঠ বজ্রযানী বৌদ্ধদের ভিতর এখনও প্রচলিত আছে। পঞ্চরক্ষার পুথি খুব যত্ন করিয়া লেখা হয়, ভালো কাগজে সোনালি, রুপোলি অক্ষরে, নানারূপ রঙিন ক্ষুদ্র চিত্র সহিত এই পুথিগুলি লেখা হয় এবং সময়ে সময়ে এই পুথিরই পূজা হয়।

পঞ্চরক্ষা দেবীর প্রত্যেকে এক একটি ধ্যানিবুদ্ধকুল হইতে উদ্ভূত হন। ধ্যানিবুদ্ধকুলের অধ্যায়ে যথাযোগ্য স্থানে ইঁহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ

করা হইয়াছে। নিষ্পন্নযোগাবলীতে একটি পঞ্চরক্ষা মণ্ডলের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। যে কোনো দেবীকে মণ্ডলে মূল দেবতা করা যাইতে পারে এবং সেস্থলে বাকি চারিটি আবরণ দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন।

পঞ্চ রক্ষাদেবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

মহাপ্রতিসরা ॥ মণ্ডলের মধ্যভাগে থাকেন মহাপ্রতিসরা দেবী চতুর্মুখা ও দ্বাদশভুজা, বজ্রপর্যঙ্কে আসীনা এবং শিরোদেশে চৈত্যশোভিতা। তাঁহার মূলমুখ পীত, দক্ষিণ শুক্ল, পশ্চিম নীল এবং বাম রক্তবর্ণ। দক্ষিণের ছয়টি ভুজে রত্নচ্ছটা, চক্র, বজ্র, শর, খড়্গ ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন। বাম ষড়্ভুজে বজ্র, পাশ, ত্রিশূল, ধনু, পরশু এবং শঙ্খ ধারণ করেন।

মহাসাহস্রপ্রমর্দিনী ॥ পূর্বদিকের এই দেবী পদ্মের উপর ললিতাসনে বসিয়া থাকেন এবং ইনি শুক্লবর্ণা, চতুর্মুখী এবং দশভুজা। ইঁহার মূলমুখ শুক্ল, দক্ষিণ নীল, পিছনে পীত এবং বাম হরিদ্বর্ণ বিশিষ্ট। পাঁচটি দক্ষিণহস্তে পদ্মস্থ অস্টার যুক্ত চক্র, বরদমুদ্রা, অঙ্কুশ, বাণ এবং কৃপাণ ধারণ কবেন এবং পাঁচটি বামভুজে বজ্র, তর্জনী, পাশ, ধনু ও দ্বিতীয় পাশ ধারণ করেন।

মহামন্ত্রানুসারিণী ॥ দক্ষিণ দিগ্-বিভাগের এই দেবী বজ্র পর্যঙ্কে বসিয়া থাকেন এবং ইনি নীলবর্ণবিশিষ্টা, ত্রিমুখা এবং দ্বাদশ ভুজা। ইঁহার মূল মুখের রং নীল, দক্ষিণের রং শুক্ল এবং বামমুখের বর্ণ রক্ত বা লাল। মূলহস্তদ্বয়ে ধর্মচক্রমুদ্রা এবং অপর হস্তদ্বয়ে সমাধিমুদ্রা প্রদর্শন করেন। বাকি চারিটি দক্ষিণহস্তে বজ্র, বাণ, বরদ এবং অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করেন। অপর চারিটি বাম হস্তে পাশযুক্ত-তর্জনী, ধনু, রত্নচ্ছটা এবং পদ্মাঙ্কিত কলশ ধারণ করিয়া থাকেন।

মহাসিতবতী ॥ পশ্চিম দিগ্-বিভাগের এই দেবী অর্ধপর্যঙ্কে বসিয়া থাকেন এবং ইনি রক্তবর্ণ বিশিস্টা। দেবী ত্রিমুখা এবং অস্টভুজা। ইঁহার

মূলমুখ লাল, দক্ষিণমুখ শুক্লবর্ণ এবং বামমুখ নীলবর্ণ। চারিটি দক্ষিণ হস্তে পদ্মসহিত অভয়মুদ্রা, শর, বজ্র এবং খড়্গ ধারণ করেন। বাম চতুর্ভুজে তর্জনীপাশ, ধনু, রত্ন এবং হৃৎপ্রদেশে পুস্তক থাকে।

মহামায়ূরী ॥ উত্তর দিকের দেবী মহামায়ূরী নরবাহনা, হরিদ্বর্ণ বিশিষ্টা, ত্রিমুখা এবং অষ্টভুজা। ইঁহার মূলমুখ হরিদ্বর্ণ, দক্ষিণ নীলবর্ণ এবং বাম শুক্লবর্ণ। চারিটি দক্ষিণ হস্তে দেবী ময়ূরপিচ্ছ, বাণ, বরদমুদ্রা এবং খড়্গ ধারণ করেন। এবং বামে চারিটি হস্তে পাত্রোপরি ভিক্ষু, ধনু, উৎসঙ্গাস্থ রত্নবর্ষী ঘট এবং বজ্ররত্নাঙ্কিত ধ্বজা ধারণ করিয়া থাকেন।

৬. পঞ্চবর্ণের তারা

বজ্রযান দেবসঙ্ঘে তারা নামটি অনেক স্ত্রী-দেবতার উপর প্রয়োগ করা হয়। তারা শব্দে কোন্ কোন্ দেবীকে বুঝায় সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকা দরকার। তারা শব্দের অর্থ যিনি তারণ অর্থাৎ উদ্ধার করেন। তারা মানবগণকে বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়াই এই নাম তাঁহার হইয়াছে। বহু স্ত্রীদেবীকেই এই নামে সম্বোধন করা হয়। তারা বলিতে শুধু সেই সেই দেবীকে বুঝিতে হইবে যাহার মন্ত্রে তারা শব্দ আছে, যথা 'ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা', ইত্যাদি। ইহাই হইল ন্যায়সঙ্গত কথা। ভালো করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যায় প্রত্যেক তারা নামক দেবীর একটি একটি বিশিষ্ট বর্ণ আছে। বর্ণ হিসাবে প্রত্যেক তারা এক একটি ধ্যানীবুদ্ধ কুলের অন্তর্বর্তী। যে তারা যে রং দেখাইবেন সেই রঙের যে ধ্যানীবুদ্ধ তাঁহার সন্ততি তিনি হইবেন। তাই যতগুলি তারানামে দেবী আছেন তাঁহাদিগকে রঙের ভিতর দিয়া শ্রেণিবিভাগ বা বর্গীকরণ করাই উত্তম পন্থা। এক নামে অভিহিত হওয়ায় সকল দেবতাই তারা জাতীয় অর্থাৎ এক জাতীয়, তাই তাহাদের পার্থক্য দেখানো প্রয়োজন।

শুক্লতারা ॥ শুক্লবর্ণের তারার ভিতর দুই এবং ততোধিক ভুজের তারা দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিভুজ মূর্তিতে দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং বামে উৎপল থাকে। অষ্টমহাভয়তারা এবং মৃত্যু বঞ্চনতারা এই শ্রেণির তারা। চতুর্ভুজ সিততারার দুই হাতে উৎপল মুদ্রা আর বাকি দুইহাতে অক্ষসূত্র ও বরদমুদ্রা দেখা যায়। ষড়্ভুজ সিততারার তিনটি মুখ ও ছয়টি হাত। এই দেবীর বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বমাতা একমুখা এবং সর্পবাহনা। তাঁহার দুই হাতে অভয়মুদ্রা ও শ্বেতপদ্ম থাকে। শ্বেত কুরুকুল্লার দুই হাত, একটিতে অক্ষসূত্র ও অপরটিতে পদ্মভাজন থাকে। জাঙ্গুলী শ্বেতবর্ণের হইলে একমুখা এবং চতুর্ভুজা হয়। দুইটি মূলহস্তে বীণা এবং অপর দুইটি হস্তে শ্বেত সর্প ও অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করেন। উপরিউক্ত সকল দেবীই তারা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

হরিত তারা ॥ দ্বিভুজ মূর্তিতে সকল প্রকার হরিত তারাই দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং বামহস্তে উৎপল ধারণ করেন। কেবল তাঁহাদের বসিবার ধরন ও আবরণ দেবতা বা পরিবার দেবতার কিছু তফাত থাকে। এই পর্যায়ে যে সকল দেবী আসেন তাঁহাদের নাম খদিরবনী তারা, বশ্যতারা, আর্যতারা, মহত্তরী তারা এবং বরদ তারা। পূর্বেই যথাস্থানে ইঁহাদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কয়েকজন হরিত তারার দুই হাতের চেয়ে বেশি হাত আছে। তাঁহাদের ভিতর প্রথম দুর্গোত্তারিণী তারা চতুর্ভুজা। ইনি দুইটি মূল হাতে পাশ ও অঙ্কুশ এবং অপর হস্তদ্বয়ে বরদমুদ্রা এবং উৎপল ধারণ করেন। দ্বিতীয়, ধনদতারা চতুর্ভুজা। মূলভুজদ্বয়ে পুস্তক ও অক্ষমালা এবং অপর ভুজদ্বয়ে উৎপল ও বরদমুদ্রা ধারণ করেন। তৃতীয় জাঙ্গুলী চতুর্ভুজা এবং চারিটি হস্তে ত্রিশূল, ময়ূরপিচ্ছ, সর্প এবং অভয়মুদ্রা ধারণ করেন। পঞ্চম পর্ণশবরী ত্রিমুখা ও ষড়্ভুজা এবং ইঁহার হরিৎ রূপ পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে।

পীততারা ॥ পীতবর্ণ তারা নানান নামে ও নানারূপে আবির্ভূত হন। প্রথম, বজ্রতারা চতুর্মুখা ও অষ্টভুজা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়, জাঙ্গুলী ত্রিমুখা ও ষড়্ভুজা। তৃতীয়, পর্ণশবরী ত্রিমুখা ও ষড়্ভুজা। ইঁহার পীতমূর্তি পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ, ভৃকুটী একমুখা ও চতুর্হস্তা। দুই দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা ও অক্ষমালা এবং দুই বামহস্তে ত্রিদণ্ডী ও কমণ্ডলু ধারণ করেন। পঞ্চম, প্রসন্ন তারা অষ্টবদনা ও ষোড়শভুজা এবং মহাভয়ংকর দর্শনা। ইঁহার মূর্তি পূর্বেই যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

নীলতারা ॥ নীলবর্ণের তারা নামে দুইজন দেবীকে পাওয়া যায়। একটি একজটা ও অপরটি মহাচিন তারা। একজটার অনেকগুলি নীলমূর্তি আছে তাহার ভিতর বিদ্যুজ্জ্বালা-করালীর বারোটি মুখ ও চব্বিশটি হাত আছে। দ্বিতীয়, মহাচিন তারা একমুখা, চতুর্ভুজা। শববাহনা এবং ভয়ংকর দর্শনা। তাঁহার মূর্তি যথাস্থানে পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

রক্ততারা ॥ বক্তবর্ণের তারার ভিতর কেবল একটি দেবীরই নাম করা যাইতে পারে। দেবীর নাম কুরুকুল্লা। ইনি অমিতাভের কুলজাত এবং অমিতাভের ন্যায় রক্তবর্ণ বিশিষ্ট, যদিও তাঁহার শ্বেতমূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। কুরুকুল্লার বিষয় অমিতাভকুলের বর্ণনার সময় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

চ. গৌর্যাদি অষ্টদেবী

আটজন গৌরী প্রমুখ দেবীরা দলবদ্ধ হইয়া মণ্ডলে আবির্ভূত হন এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিকগ্রন্থে তাঁহাদের জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নেপালি এবং ভুটিয়া মণ্ডলচিত্রে এই আট জনকে সময়ে সময়ে দেখা যায়, কিন্তু পিকিং শহরের মন্দিরে তাঁহাদের পৃথক ধাতুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেকটি মূর্তিতে দেবতাদের নাম খোদাই করাও দেখা

গিয়াছে। সেইজন্য এই দেবীদের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। নিষ্পন্নযোগাবলীর পঞ্চডাক মণ্ডলে ইঁহাদের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাই এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হইল। এস্থলে দেবীরা ভীষণদর্শনা, নগ্না, শুষ্কনৃমুণ্ডমালা সুশোভিতা এবং প্রত্যালীঢ়াসনা।

দেবীরা সকলেই বামহস্তে হৃৎপ্রদেশে মুষ্টি সহিত তর্জনী প্রদর্শন করেন এবং পদ্মের উপর নৃত্য করিতে থাকেন।

আটজন দেবীই সাধারণত দেখিতে এক প্রকারের, কেবল পার্থক্য তাঁহাদের বর্ণে এবং দক্ষিণ হস্তস্থিত প্রহরণে। দক্ষিণ হস্তে তাঁহারা যে যে অস্ত্র বা মুদ্রা ধারণ করেন তাহা হইতেই তাঁহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে। নিম্নে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল:

গৌরী ॥ শ্বেতবর্ণা দক্ষিণে অঙ্কুশধারী।

চৌরী ॥ পীতবর্ণা দক্ষিণে পাশধরা।

বেতালী ॥ রক্তবর্ণা দুই হাতে শৃঙ্খলধারী।

ঘস্মরী ॥ হরিদ্বর্ণা দক্ষিণে বজ্রাঙ্কিত ঘণ্টাধারী।

পুক্কসী ॥ নীলবর্ণা দক্ষিণে বোধিচিত্তঘটহস্তা।

শবরী ॥ শুভ্রবর্ণা দক্ষিণে মেরুপর্বতধারী।

চণ্ডালী ॥ নীলবর্ণা দক্ষিণে বহ্নিকুণ্ডধারী।

ডোম্বী ॥ বিচিত্রবর্ণা দক্ষিণে মহাধ্বজপতাকা ধারণ করেন।

ছ. লাস্যাদি দেবীচতুষ্টয়

লাস্যা, মালা, গীতা এবং নৃত্যা এই চারিটি দেবী একযোগে মণ্ডলে আবির্ভূত হন। ইঁহাদের ধাতুমূর্তি পিকিং শহরে পাওয়া গিয়াছে। নিষ্পন্নযোগাবলীর পঞ্চডাক মণ্ডলে ইঁহাদের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহাদের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল। তাঁহারা সকলেই দেখিতে এক প্রকারের, কেবল

তাঁহাদের বর্ণ এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি ভিন্ন।

লাস্যা ॥ ইঁহার বর্ণ লাল এবং সগর্বে ইনি দুই হাতে লাস্য অভিনয় করিয়া থাকেন।

মালা ॥ ইঁহার বর্ণও লাল এবং ইনি দুই হস্তে রত্নমালা ধারণ করেন।

গীতা ॥ ইঁহার বর্ণ রক্তমিশ্রিত গৌরবর্ণ এবং ইনি দুই হাতে কাঁসি বাজাইয়া থাকেন।

নৃত্যা ॥ ইনি বিচিত্রবর্ণা এবং দুইটি হাতে বজ্র ধারণ করিয়া মহানন্দে নৃত্যশীলা।

জ. বংশাদি দেবীচতুষ্টয়

চার প্রকার বাদ্যযন্ত্রকে দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। এই দেবীরা মধ্যে মধ্যে মণ্ডলে অবতীর্ণ হন। ইঁহাদের ধাতুমূর্তি পিকিং শহরে পাওয়া গিয়াছে। নিষ্পন্নযোগাবলীতে এই দেবী চতুষ্টয়ের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল। তাঁহারা সকলেই দেখিতে এক প্রকারের, তাঁহাদের ভিতর পার্থক্য কেবল বর্ণের এবং বাদ্যযন্ত্রের।

বংশা ॥ রক্তবর্ণা, দুই হাতে বাঁশের বাঁশি ধরিয়া বাজাইতে থাকেন।

বীণা ॥ পীতবর্ণা, দুই হাতে বীণা ধরিয়া তাহাই বাজাইতে থাকেন।

মুকুন্দা ॥ শুভ্রবর্ণা, দুই হাতে মুকুন্দ নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে থাকেন।

মুরজা ॥ ধূম্রবর্ণা, দুই হাতে মুরজ নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে থাকেন।

ঝ. দ্বার দেবীচতুষ্টয়

বাড়ির দরজা এবং সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন পদার্থ দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছিল। এই দ্বারদেবীরা চারিজন মণ্ডলে আবির্ভূত হন এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইঁহাদের ধাতুমূর্তিও পিকিং শহরে পাওয়া গিয়াছে। নিষ্পন্নযোগাবলীতে ইঁহাদের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :

তালিকা ॥ শুভ্রবর্ণা, দুই হাতে একটি তালা ধারণ করেন।
কুণ্ঠী ॥ পীতবর্ণা, দুইটি হাতে চাবি ধারণ করেন।
কপাটা ॥ রক্তবর্ণা, দুই হাতে দরজার কপাট ধরিয়া থাকেন।
পটধারিণী ॥ নীলবর্ণা, দুই হাতে একখানি পর্দা ধরিয়া রাখেন।

ঞ. রশ্মি দেবীচতুষ্টয়

চারি প্রকারের আলোক বা দীপ্তিকে চারিটি দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। ইঁহাদের মূর্তিও পিকিং শহরে পাওয়া গিয়াছে। নিষ্পন্নযোগাবলীতে ইঁহাদের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল। ইঁহারা দেখিতে একই প্রকারের ভীষণদর্শনা, প্রত্যালীঢ়পদে নৃত্যস্থা। ইঁহাদের পার্থক্য কেবল বর্ণে এবং প্রতীকচিহ্নে।

সূর্যহস্তা ॥ শুভ্রবর্ণা, দুইহস্তে সূর্যমণ্ডল ধারণ করেন।
দীপা ॥ নীলবর্ণা, দুইহস্তে দীপযষ্টি ধারণ করেন।
রত্নোল্কা ॥ পীতবর্ণা, দুইহস্তে রত্ন ধারণ করেন।
তড়িৎকরা ॥ হরিদ্বর্ণা, দুইহস্তে তারের মতো বিদ্যুল্লতা ধারণ করেন।

ট. পশুমুখী দেবীচতুষ্টয়

কয়েকটি পশুকে বজ্রযানে দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন পশুর নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। ইঁহাদের ব্যবহার মণ্ডলে প্রায়শ করা হইত এবং ইঁহাদের মূর্তিও পিকিং শহর হইতে পাওয়া গিয়াছে। নিষ্পন্নযোগাবলী হইতে ইঁহাদের বিবরণ যাহা পাওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল। ইঁহারা সকলেই দেখিতে এক প্রকারের নগ্না এবং ভীষণদর্শনা। কখনও ইঁহারা দ্বিভুজ মূর্তিতে কল্পিত হন। সেক্ষেত্রে তাঁহাদের হাতে কর্ত্রি ও কপাল থাকে এবং একটি খট্বাঙ্গ বামস্কন্ধ হইতে ঝুলিতে থাকে। তাঁহাদের পার্থক্য কেবল মুখ দেখিয়াই বুঝিতে হয়। অন্য

পক্ষে তাঁহারা চতুর্মুখা ও চতুর্ভুজা এবং তাঁহারা বজ্রাঙ্কুশী প্রমুখ দেবতাদের প্রতীক চিহ্ন ধারণ করেন, যথা:

হয়াস্যাবাঘোটকমুখী ॥ দেবী দেখিতে বজ্রাঙ্কুশীর ন্যায় চতুর্মুখা ও চতুর্ভুজা। ইনি পূর্বদ্বারের দেবী এবং ইঁহার বর্ণ সিতনীল।

শূকরাস্যাবাশূকরমুখী ॥ দেবী দেখিতে বজ্রপাশীর ন্যায়। ইনি দক্ষিণ দিশায় অবস্থান করেন এবং ইঁহার বর্ণ পীতমিশ্রিত নীল।

শ্বানাস্যাবাকুক্কুরমুখী ॥ দেবী দেখিতে বজ্রাস্ফোটার ন্যায়। ইনি পশ্চিম দিশায় অবস্থান করেন এবং ইঁহার রং রক্তমিশ্রিত নীল।

সিংহাস্যাবাসিংহমুখী ॥ দেবী দেখিতে বজ্রঘণ্টার ন্যায়। ইনি উত্তর দিশায় অবস্থান করেন এবং ইঁহার বর্ণ রক্তমিশ্রিত নীল।

ঠ. ডাকিন্যাদি দেবীচতুষ্টয়

এই শ্রেণিতে চারিটি দেবীর নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের নাম, ডাকিনী, লামা, খণ্ডরোহা এবং রূপিণী। অনেক মণ্ডলে ইঁহাদের দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যখনই ইঁহারা আসেন তখনই চারিজন এক সঙ্গেই আসেন। ইঁহাদের আলাদা আলাদা কখনোই দেখা যায় না। সাধনমালায় ইঁহাদের বিবরণ দেওয়া আছে। সে বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে সকলেই দেখিতে একই প্রকারের ভীষণদর্শনা এবং ইঁহারা আলীঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই একমুখা এবং চতুর্ভুজা, দুইটি দক্ষিণ হস্তে ডমরু এবং কর্ত্রি ধারণ করেন এবং দুইটি বামহস্তে কপালাঙ্কিত খট্বাঙ্গ এবং কপাল ধারণ করেন। ইঁহাদের পার্থক্য দেখা যায় একমাত্র বর্ণে যথা :

ডাকিনী ॥ নীলবর্ণা।

লামা ॥ হরিদ্বর্ণা।

খণ্ডরোহা ॥ রক্তবর্ণা

রূপিণী ॥ শুভ্রবর্ণা।

দ্বাদশ অধ্যায়

দার্শনিক দেবতা

বৌদ্ধধর্মের নানাপ্রকারের দার্শনিক তত্ত্ব বজ্রযানে দেবদেবীরূপে কল্পিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের পারমিতা সর্বজনবিদিত। পারমিতা এক একটি গুণের পরমোৎকর্ষ যেমন দান, শীল, প্রজ্ঞা, ইত্যাদি। এই গুণগুলি পরমোৎকর্ষ লাভ করে একমাত্র জগৎকারণ পরাশূন্যে। এই পরাশূন্যের গুণাবলী অভ্যাস করিলে মোক্ষ বা বোধিজ্ঞান লাভ হয়। পারমিতাগুলিকে বজ্রযানে দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মে দশটি ভূমি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর কল্পনা করা হইয়াছিল। এই ভূমিগুলিকেও দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। বশিতা অর্থাৎ মনঃসংযমের স্থলগুলিও দেবী রূপে কল্পিত হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় পিকিং শহরে এই সকল দেবীর ধাতুমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্তিশাস্ত্রে তাই এই কল্পনার মূল্য আছে বলিয়া তাহার বিবরণ গ্রন্থে দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। এক এক করিয়া উক্ত দার্শনিক শ্রেণির দেবতাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

ক. দ্বাদশ পারমিতা

পারমিতা বা গুণাবলীর চরমোৎকর্ষ, দশটি মহাযানে ছিল। এ গুণগুলি শূন্যের গুণ বলিয়া মানা হইত। কথিত আছে ভগবান বুদ্ধ তাঁহার পূর্ব জীবনগুলিতে একটি একটি পারমিতা অভ্যাস করিয়া তাহাতে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। এবং এই পুণ্যের ফলে শেষ জন্মে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষের অধিকারী হইয়াছিলেন। বজ্রযানে দশ পারমিতার উপর দুইটি বেশি পারমিতা যোগ করিয়া তাহার সংখ্যা দ্বাদশ করা হইয়াছিল। নিষ্পন্নযোগাবলীতে এই দ্বাদশটি পারমিতার মূর্তি-কল্পনা দেওয়া আছে।

ইঁহাদের সকলেরই কুলেশ রত্নসম্ভব একথাও নিষ্পন্নযোগাবলীতে বলা হইয়াছে। নিম্নে তাঁহাদের রূপ-কল্পনা দেওয়া হইল। যে ক্রমে নিষ্পন্নযোগাবলীতে তাঁহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই ক্রমে এখানেও তাঁহাদের বিবরণ দেওয়া হইল। এই পারমিতা দেবীগুলিকে দেখিতে প্রায়ই একরকমের কিন্তু তাহাদের পার্থক্য বর্ণে এবং দক্ষিণ হস্তের প্রতীক চিহ্নে থাকে। তাঁহাদের দুইটি হাত ও একটি মুখ এবং তাঁহাদের সকলেরই বাম হাতে চিন্তামণি রত্নাঙ্কিত একটি ধ্বজা থাকে এবং দক্ষিণে স্ব স্ব চিহ্ন থাকে। প্রজ্ঞাপারমিতার রূপ কেবল স্বতন্ত্র। ইঁহার চারিটি হাত হয় এবং সেই হাতে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন থাকে। তাঁহাদের বর্ণ এবং প্রতীক মাত্রই নিম্নে দেওয়া হইল :

রত্নপারমিতা ॥ ইনি রক্তবর্ণা এবং দক্ষিণ হস্তে পদ্মের উপর চন্দ্রমণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন।

দানপারমিতা ॥ ইনি শ্বেত মিশ্রিত রক্তবর্ণা এবং দক্ষিণ হস্তে নানা প্রকারের ধান্য মঞ্জরি ধারণ করেন।

শীলপারমিতা ॥ ইনি শ্বেতবর্ণা এবং দক্ষিণ হস্তে পল্লব সহিত গৌরকুসুমে নির্মিত চক্র ধারণ করেন।

ক্ষান্তিপারমিতা ॥ ইনি পীতবর্ণা এবং দক্ষিণ হস্তে শ্বেত পদ্ম ধারণ করেন।

বীর্যপারমিতা ॥ ইনি মরকতের ন্যায় হরিদ্বর্ণা এবং দক্ষিণ হস্তে নীল উৎপল ধারণ করেন।

ধ্যানপারমিতা ॥ ইনি নভঃ-শ্যামবর্ণা এবং দক্ষিণ হস্তে শ্বেত পদ্ম ধারণ করেন।

প্রজ্ঞাপারমিতা ॥ পারমিতা দেবীদের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা শীর্ষস্থানীয়।

প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে তাঁহার রূপ-কল্পনা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে প্রজ্ঞাগুণের চরমোৎকর্ষতা দর্শক মূর্তি বর্ণিত হইতেছে। প্রজ্ঞাপারমিতা কনককান্তি, শোভন দর্শনা এবং চতুর্ভুজা। দুইটি প্রধান হস্তে ধর্মচক্র মুদ্রা প্রদর্শন করেন, অপর দক্ষিণ হস্তে পদ্মস্থ পুস্তক থাকে এবং অন্য বাম হস্তে অন্যান্য পারমিতা দেবীর ন্যায় ইনি রত্নাঙ্কিত ধ্বজা ধারণ করেন।

উপায়পারমিতা ॥ ইনি প্রিয়ঙ্গুফলের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং দক্ষিণ হস্তে পীত পদ্মের উপর বজ্র ধারণ করেন। বামহস্তে অন্যান্য দেবীর ন্যায় ধ্বজা ধারণ করেন।

প্রণিধানপারমিতা ॥ ইনি নীল উৎপলের ন্যায় বর্ণ বশিষ্টা এবং দক্ষিণ হস্তে নীলোৎপলের উপর খড়্গ ধারণ করেন।

বলপারমিতা ॥ ইনি রক্তবর্ণা দক্ষিণ হস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক ধারণ করেন।

জ্ঞানপারমিতা ॥ ইনি শুভ্রবর্ণা এবং দক্ষিণ হস্তে নানা রত্ন ও ফলের দ্বারা অলংকৃত বোধিবৃক্ষ ধারণ করেন।

বজ্রকর্মপারমিতা ॥ ইনি বিচিত্রবর্ণা এবং দক্ষিণ হস্তে নীলোৎপলের উপর বিশ্ববজ্র ধারণ করেন।

বলাবাহুল্য, সকল দেবীরই বামহস্তে চিন্তামণি রত্নাঙ্কিত ধ্বজা শোভিত হয়।

খ. দ্বাদশ বশিতা

বৌদ্ধধর্মে অনেকগুলি বশিতা মানা হইয়াছে। আত্মোন্নতির জন্য এবং বোধিজ্ঞান লাভের জন্য যে সকল সংযম ও নিয়মাদি মানিয়া চলিতে হয় সেই সেই নিয়ম স্থলগুলিকেই বশিতা বলা হইয়া থাকে। বজ্রযানে বশিতার

সংখ্যা দ্বাদশ বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং প্রত্যেকের একটি একটি বিশেষ নাম ও রূপ দেওয়া হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একদিকে যেমন তন্ত্রশাস্ত্রে ইঁহাদের রূপের বিবরণ পাওয়া যায় আর-একদিকে তেমনি তাঁহাদের ধাতুনির্মিত মূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলি পিকিং শহর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দলবদ্ধভাবে দ্বাদশ বশিতা ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভকুলের সন্তানরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। নিষ্পন্নযোগাবলীতে ইঁহাদের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে তাঁহারা সকলেই দেখিতে প্রায় একই রকমের, সৌম্যমূর্তি ও দ্বিভুজা। সকলেরই দক্ষিণ হস্তে পদ্ম থাকে। তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু বর্ণে এবং বামহস্তস্থিত স্ব স্ব চিহ্নে বা প্রতীকে। বশিতা দেবীদের বিবরণ একের পর এক নিম্নে দেওয়া হইল:

আয়ুর্বশিতা ॥ ইনি শ্বেতমিশ্রিত রক্তবর্ণ বিশিষ্টা এবং বামহস্তে পদ্মরাগমণি নির্মিত সমাধি মুদ্রাযুক্ত বুদ্ধমূর্তি ধারণ করেন। দক্ষিণে পদ্ম থাকে।

চিত্তবশিতা ॥ ইনি শুভ্রবর্ণা এবং বামহস্তে পঞ্চমুখী রক্তবর্ণ বজ্র ধারণ করেন।

পরিষ্কার বশিতা ॥ ইনি পীতবর্ণা এবং বামহস্তে চিন্তামণিযুক্ত ধ্বজা ধারণ করেন।

কর্মবশিতা ॥ ইনি হরিদ্বর্ণা এবং বামহস্তে বিশ্ববজ্র ধারণ করেন।

উপপত্তি বশিতা ॥ ইনি বিচিত্র বর্ণা এবং বামহস্তে বিবিধবর্ণের এবং বিবিধ জাতীয় লতা ধারণ করেন।

ঋদ্ধিবশিতা ॥ ইনি নভঃ শ্যামবর্ণা এবং বামহস্তে পদ্মের উপর সূর্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল ধারণ করেন।

অধিমুক্তিবশিতা ॥ ইনি মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণা এবং বামহস্তে প্রিয়ঙ্গু পুষ্পের মঞ্জরি ধারণ করেন।

প্রণিধান বশিতা ॥ ইনি পীতবর্ণা এবং বামহস্তে নীলোৎপল রূপ স্বচিহ্ন ধারণ করেন।

জ্ঞান বশিতা ॥ ইনি শুভ্রবর্ণা এবং বামহস্তে নীলোৎপলের উপর একটি খড়্গ স্বচিহ্ন স্বরূপ ধারণ করেন।

ধর্ম বশিতা ॥ ইনি শুভ্রবর্ণা এবং বামহস্তে রক্তবর্ণ পদ্মের উপর ভদ্রঘট স্বচিহ্ন স্বরূপ ধারণ করেন।

তথতাবশিতা ॥ ইনি শুভ্রবর্ণা এবং বামহস্তে রত্নমঞ্জরি স্বচিহ্ন রূপে ধারণ করেন।

বুদ্ধবোধিপ্রভা বশিতা ॥ ইনি কনকাভা এবং দক্ষিণ হস্তে পঞ্চমুখ একটি বজ্র পীত পদ্মের উপর ধারণ করেন। বামহস্তে চিন্তামণি যুক্ত ধ্বজের উপর একটি চক্র ধারণ করেন। এই শেষোক্ত দেবীর রূপকল্পনায় একটু ভেদ পরিলক্ষিত হইবে।

গ. দ্বাদশ ভূমি

হিন্দুরা যেরূপ কতকগুলি স্বর্গলে · কল্পনা করে, ঠিক সেইরূপ বৌদ্ধেরা কয়েকটি লোক ও ভূমি কল্পনা ক্রে। মানুষ মরিবার পর কর্ম অনুসারে নীচের বা উপরের লোকে বাস করে। হিন্দুদের মতে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহ, জন, তপ এবং সত্যলোক এই সাতটি লোকের কল্পনা করা হয়। পুণ্যকর্ম বেশি পাপকর্ম কম হইলে স্বরাদি লোকের অধিকারী হইয়া থাকে এর পাপকর্ম বেশি ও পুণ্যকর্ম কম হইলে ভুর্ভুবাদি লোকের অধিকারী হয়। তবে যদি একবার স্বর্লোকে প্রবেশ করিতে পারা যায় তাহা হইলে পাপকর্ম সত্ত্বেও নিম্নের লোকে আসিতে হয় না। ঠিক সেইরূপ বৌদ্ধদের

নরক, তির্যক, প্রেত ও অসুর লোক আছে। ইহার উপরে দশটি, বজ্রযান মতে দ্বাদশটি, ভূমিরূপ স্বর্গ আছে। একবার চতুর্থ ভূমিতে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে কর্মবশে তাহাকে আর নিম্নলোকে আসিতে হয় না। এইরূপে পাপকর্ম সম্পূর্ণ ক্ষয় হইয়া গেলে পূর্ণ জ্ঞান, সর্বজ্ঞতা ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে এবং সর্বোচ্চ ভূমি প্রাপ্তি হয়। বজ্রযানীরা ভূমিগুলিকে দেবতার রূপ দিয়াছিল। তাঁহাদের রূপ নিষ্পন্নযোগাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে এবং পিকিং শহরে তাঁহাদের মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দেবতারা অক্ষোভ্যকুলের সন্তান বলিয়া পরিচিত। রূপগুলি অনুধাবন করিলে দেখা যায় তাঁহারা আকৃতিতে প্রায় সকলেই অনুরূপ। সকলেই দ্বিভুজা এবং দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ করেন। তাঁহাদের কেবল বর্ণ ভিন্ন হয় এবং তাঁহাদের বামহস্তে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন বা প্রতীক থাকে। তাঁহাদের বর্ণ এবং প্রতীক-চিহ্ন একে একে নিম্নে দেওয়া হইল:

অধিমুক্তিচর্যা ॥ এই ভূমিদেবী পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণা এবং স্বচিহ্ন পদ্ম ধারণ করেন।

প্রমুদিতা ॥ এই ভূমিদেবী রক্তবর্ণা এবং বামহস্তে স্বচিহ্ন চিন্তামণি ধারণ করেন।

বিমলা ॥ এই ভূমিদেবী শুক্লবর্ণা। শুক্ল কমল তাহার স্বচিহ্ন।

প্রভাকরী ॥ এই ভূমিদেবী রক্তবর্ণা। ইঁহার প্রতীকচিহ্ন বিশ্বপদ্মের উপর সূর্যমণ্ডল।

অর্চিষ্মতী ॥ এই ভূমিদেবী মরকতের ন্যায় হরিদ্বর্ণা এবং ইঁহার প্রতীকচিহ্ন নীল উৎপল।

সুদুর্জয়া ॥ এই ভূমিদেবী পীতবর্ণা। বামহস্তে উৎসঙ্গের উপর উত্তান হস্তে মরকত মণি ধারণ করেন।

অভিমুখী ॥ এই ভূমিদেবী হেমবর্ণা। ইঁহার স্বচিহ্ন পদ্মের উপর প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।

দুরঙ্গমা ॥ এই ভূমিদেবী গগনের ন্যায় শ্যামবর্ণা। ইঁহার প্রতীক চিহ্ন বিশ্বপদ্মের উপর একটি বিশ্ববজ্র।

অচলা ॥ এই ভূমিদেবী শরচ্চন্দ্রের ন্যায় আভা বিশিষ্টা। ইঁহার প্রতীক পঞ্চমুখ বজ্রাঙ্কিত পদ্ম।

সাধুমতী ॥ এই ভূমিদেবী শ্বেতবর্ণা এবং ইঁহার প্রতীক চিহ্ন খড়্গাঙ্কিত উৎপল।

ধর্মমেঘা ॥ এই ভূমিদেবী নীলবর্ণা। প্রতীক চিহ্ন স্বরূপ ধর্মরূপ মেঘ দিয়া প্রস্তুত প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক দেবী বামহস্তে ধারণ করেন।

সমস্তপ্রভা ॥ এই ভূমিদেবী মধ্যাহ্ন সূর্যের বর্ণ বিশিষ্টা এবং ইনি বামহস্তে পূর্ণবোধিজ্ঞানের দ্যোতক একটি অমিতাভ বুদ্ধের ক্ষুদ্রমূর্তি ধারণ করেন।

বলাবাহুল্য, সকল দেবীই দক্ষিণ হস্তে কুলচিহ্ন বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন।

ঘ. দ্বাদশ ধারিণী

বজ্রযানে নানা রকমের মন্ত্র পাওয়া যায়। যথা বীজমন্ত্র, তারার 'তাঁ', পাণ্ডরার 'পাঁ' ইত্যাদি। তারপর আছে হৃদয়মন্ত্র 'আরোলিক্', 'বজ্রধৃক্', 'প্রজ্ঞাধৃক্', ইত্যাদি। আরও আছে জপমন্ত্র যথা 'ওঁ সিংহনাদ হুঁ ফট্,' 'ওঁ মঞ্জুঘোষ হ্রীঃ জঃ' ইত্যাদি। ইহা ছাড়া মালামন্ত্র অর্থাৎ যাহা মালা সংযোগে জপ করিতে হয়, শতাক্ষর মন্ত্র ইত্যাদি নানা প্রকারের মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রের ভিতর সর্বাপেক্ষা বড়ো মন্ত্র হইল ধারণী বা ধারিণী। এইগুলি হইতে তীব্র শক্তি বাহির হয় এবং মন্ত্র শব্দের স্পন্দন ঘন, ঘনতর ও ঘনতম

হইয়া অদৃশ্য শক্তির উৎপত্তি হয়। বোধিচিত্তের তীব্র ভাবনার সহিত যুক্ত হইয়া এই শক্তি সাধকের ইচ্ছানুসারে কার্য করিতে সক্ষম হয়। তন্ত্রে বলে 'কিমস্ত্যসাধ্যং মন্ত্রণাং যোজিতানাং যথাবিধি'—অর্থাৎ যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে মন্ত্রশক্তির অসাধ্য কোনো কার্যই থাকিতে পারে না।

বজ্রযানে অসংখ্য ধারিণী আছে। তাহাদের ভিতর দ্বাদশটি শীর্ষস্থানীয় বলিয়া তাহাদের মূর্তি কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাদের বিবরণ নিষ্পন্ন-যোগাবলীতে পাওয়া যায়, আবার পিকিং শহর হইতে কতকগুলির ধাতুমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে, কাজেই এই গ্রন্থে ধারিণী দেবীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইতেছে। দ্বাদশ দেবীর মূর্তি কল্পনা একই প্রকারের, তাঁহাদের বর্ণে এবং প্রতীকচিহ্নে কেবল ভেদ আছে। ইঁহারা দলবদ্ধ হইয়া মণ্ডলে আবির্ভূত হন, এবং ইঁহারা সকলেই ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির সন্ততিরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকেন। নিম্নে এক একটি করিয়া ধারিণী দেবীদের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। ইঁহাদের সকলেরই একটি মুখ ও দুইটি হাত। সকলেই দক্ষিণ হস্তে কুলচিহ্ন বিশ্ববজ্র ধারণ করেন এবং বাম হস্তে স্ব স্ব চিহ্ন ধারণ করেন

সুমতি ॥ এই ধারিণী দেবী পীতবর্ণা। ইঁহার স্বচিহ্ন ধান্যমঞ্জরি দেবী বামহস্তে ধারণ করেন। দক্ষিণ হস্তে থাকে বিশ্ববজ্ররূপ কুলচিহ্ন।

রত্নোল্কা ॥ এই ধারিণী রক্তবর্ণা এবং ইঁহার চিহ্ন চিন্তামণি ধ্বজা দেবীর বামহস্তে থাকে।

উষ্ণীষবিজয়া ॥ এই ধারিণী দেবী শুক্লবর্ণা এবং ইঁহার বামহস্তে চন্দ্রকান্ত মণিযুক্ত কলশ থাকে।

মারী ॥ এই ধারিণী দেবী রক্ত মিশ্রিত গৌরবর্ণা এবং বামহস্তে স্বচিহ্ন সূত্র সহিত সূচি ধারণ করেন।

পর্ণশবরী ॥ এই ধারিণী দেবী শ্যামবর্ণা। ইঁহার স্বচিহ্ন ময়ূরপিচ্ছ। ইঁহার অন্যান্য রূপ বিস্তৃতভাবে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

জাঙ্গুলী ॥ এই ধারিণী দেবী শুক্লবর্ণা। ইঁহার স্বচিহ্ন বিষপুষ্প মঞ্জরি। জাঙ্গুলীর বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে।

অনন্তমুখী ॥ এই ধারিণী দেবী হরিদ্বর্ণা। ইঁহার স্বচিহ্ন রক্ত পদ্মের উপর অক্ষয় মহানিধি পূর্ণকলশ।

চুন্দা ॥ চুন্দা দেবী শুক্লবর্ণা। ইঁহার স্বচিহ্ন অক্ষসূত্র হইতে অবলম্বিত কমণ্ডলু। ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

প্রজ্ঞাবর্ধনী ॥ এই ধারিণী দেবী শুক্লবর্ণা। নীলোৎপলের উপর খড়্গ ইঁহার স্বচিহ্ন বামহস্তে থাকে।

সর্বকর্মাবরণবিশোধনী ॥ এই ধারিণী দেবী হরিদ্বর্ণা, ত্রিমুখী, বজ্রাঙ্কিত শ্বেতপদ্ম ইঁহার স্বচিহ্ন এবং দেবী উহা বামহস্তে ধারণ করেন।

অক্ষয়জ্ঞানকরণ্ডা ॥ এই ধারিণী দেবী রক্তবর্ণা এবং ইঁহার প্রতীক রত্নকরণ্ড বা রত্নপূর্ণ একটি ঝুড়ি ধারণ করেন।

সর্ববুদ্ধধর্মকোষবতী ॥ এই শেষ ধারিণী দেবী পীতবর্ণা, পদ্মের উপর নানা রত্নপূর্ণ পেটিকা ধারণ করিয়া থাকেন। সকল দেবীরই দক্ষিণ হস্তে কুলচিহ্ন বিশ্ববজ্র থাকে। সে কথা অগ্রেই বলা হইয়াছে।

৬. প্রতিসম্বিৎ চতুষ্টয়

ন্যায় বা তর্কের বিশ্লেষণ কালে চারিটি মূলীভূত বস্তু পাওয়া যায়। সেইগুলিকে প্রতিসম্বিৎ বলা হয়। প্রথমটি ধর্ম প্রতিসম্বিৎ অর্থাৎ মূল প্রকৃতি, দ্বিতীয়টি অর্থ অর্থাৎ বিশ্লেষণ, তৃতীয়টি নিরুক্তি অর্থাৎ পদমূলক বিশ্লেষণ এবং চতুর্থটি প্রতিভান বা পূর্বাপর সম্বন্ধ। বজ্রযানীরা এইগুলিকেও দেবতারূপে কল্পনা করিতে ছাড়ে নাই! নিষ্পন্নযোগাবলীতে ইহাদের মূর্তির

বিবরণ আছে এবং উহাদের ধাতুমূর্তি পিকিং শহরে পাওয়া গিয়াছে। এই চারিটির কুলেশ ভিন্ন ভিন্ন। ধর্মের কুলেশ অক্ষোভ্য, অর্থের কুলেশ রত্নসম্ভব, নিরুক্তির কুলেশ অমিতাভ এবং প্রতিভানের কুলেশ অমোঘ-সিদ্ধি। এই চারিটি দেবী দেখিতে এক প্রকারের কিন্তু ইহাদের বর্ণ ভিন্ন এবং দুই হাতের চিহ্নেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাহাদের রূপ নিম্নে দেওয়া হইল।

ধর্মপ্রতিসম্বিৎ ॥ পূর্বদ্বারে অবস্থিত এই দেবী শুক্ল মিশ্রিত রক্তবর্ণা। তাঁহার দুই হাতে বজ্রাঙ্কিত অঙ্কুশ ও পাশ থাকে।

অর্থপ্রতিসম্বিৎ ॥ দক্ষিণ দ্বারে অবস্থিত এই দেবী মরকত মণির ন্যায় হরিদ্বর্ণা। তিনি দুই হস্তে রত্নপাশ ধরিয়া থাকেন।

নিরুক্তিপ্রতিসম্বিৎ ॥ পশ্চিম দ্বারে অবস্থিত এই দেবী রক্তবর্ণা। ইনি ভুজদ্বয়ে পদ্মের নাল দিয়া নির্মিত শৃঙ্খল ধারণ করেন।

প্রতিভানপ্রতিসম্বিৎ ॥ উত্তরদ্বারে অবস্থিত এই দেবী মরকত মণির ন্যায় শ্যামবর্ণা। ইনি দুই হস্তে ত্রিমুখী বজ্রের দ্বারা মুদ্রিত ঘণ্টা ধারণ করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বৌদ্ধবেশে হিন্দু দেবতা

অনেকের ধারণা বৌদ্ধ দেবসংঘে শুধু বৌদ্ধ দেবতাই ছিল, অন্য কোনো ধর্মের কোনো দেবতা সে সংঘে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ কথা ঠিক নহে। বৌদ্ধ দেবসংঘে প্রভূত পরিমাণে হিন্দু দেবতাদের লওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নূতন রূপও কোথাও কোথাও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমস্ত হিন্দু দেবতাদের জন্য পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ কুলের ভিতর এক একটি কুল ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি মহাদেব বিষ্ণু, ব্রহ্মাও ইহা হইতে বাদ পড়েননি। ইহাদের এক একটি ধ্যানীবুদ্ধকে কুলেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে, সকল হিন্দু দেবতাই শরীরের বর্ণ অনুযায়ী এক একটি ধ্যানীবুদ্ধের কুলভুক্ত হইতেন। যেমন সাদা রঙের দেবতা বৈরোচনের সন্ততি, সবুজ রঙের দেবতা অমোঘ-সিদ্ধির, লাল রঙের অমিতাভের, পীত রঙের রত্নসম্ভবের এবং নীল রঙের দেবতা অক্ষোভ্যের সন্ততি বলিয়া গণ্য হইতেন। বৌদ্ধ দেবসংঘের ভিতর এত বেশি হিন্দু দেবতাদের বর্ণনা আছে যে তাহাদের প্রথমে শ্রেণি বিভাগ করিয়া পরে বিবরণ দিতে হয়। মনে রাখা দরকার যে, এই সকল হিন্দু দেবতার শুধু রূপকল্পনাই তন্ত্র সাহিত্যে হয় নাই বৌদ্ধ দেশ সমূহেও ইঁহাদের মূর্তি প্রস্তুত হইত এবং মাঞ্চুরিয়ার পিকিং শহর হইতেও তাঁহাদের ভূরি ভূরি ধাতুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। পর পৃষ্ঠায় হিন্দু দেবতাদিগের শ্রেণি বিভাগ করিয়া বিবরণ দেওয়া হইল।

ক. অষ্ট দিক্‌পাল

আটটি দিশার দিক্‌পালদের বিবরণ নিষ্পন্নযোগাবলীতে পাওয়া যায়। যমান্তক প্রজ্ঞান্তকাদির ন্যায় হিন্দু দিক্‌পালদেরও মণ্ডলে ব্যবহার ছিল। ইহাদের নানারূপ মূর্তি কল্পিত হইয়াছিল, কখনও কখনও শক্তি সহিত যুগনদ্ধ মূর্তিতেও ইহাদের কল্পনা হইত। সমস্ত প্রকারের রূপ কল্পনা এখানে দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া সাদাসিধা রূপগুলিরই বিবরণ একে একে নিম্নে দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকের ধাতুমূর্তি পিকিঙে পাওয়া গিয়াছে।

ইন্দ্র ॥ পূর্ব দিশার অধিপতি ইন্দ্র পীত বর্ণের। ইঁহার একমুখ, দুই হাত এবং বাহন ঐরাবত হস্তী। একটি হাতে বজ্র ও আর-একটি হস্তে স্তন স্পর্শ করেন। ইঁহার পীতবর্ণ রত্নসম্ভবের দ্যোতক।

যম ॥ দক্ষিণ দিশার অধিপতি যমদেব নীলবর্ণ। ইঁহার একমুখ ও দুই হাত। ইঁহার বাহন মহিষ। একটি হাতে যমদণ্ড ও একটি হস্তে শূল ধারণ করেন। ইঁহার নীল বর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

বরুণ ॥ পশ্চিম দিশার অধিপতি বরুণ শুভ্র বর্ণ এক মুখ ও দ্বিভুজ। ইঁহার বাহন মকর বা কুম্ভীর। ইনি একটি হস্তে সর্প নির্মিত পাশ বা নাগপাশ এবং আর একটিতে শঙ্খ ধারণ করেন। ইঁহার শ্বেতবর্ণ বৈরোচনের দ্যোতক।

কুবের ॥ উত্তর দিশার অধিপতি কুবের পীতবর্ণ একমুখ ও দ্বিভুজ। ইনি নরবাহন। দুইটি হস্তে অঙ্কুশ ও গদা ধারণ করেন। ইঁহার পীতবর্ণ রত্নসম্ভবের দ্যোতক।

ঈশান ॥ ঈশান কোণের অধিপতি ঈশানদেব শ্বেতবর্ণ, একমুখ, দ্বিভুজ ও বৃষবাহন। ইনি দুইটি হস্তে ত্রিশূল ও কপাল ধারণ করেন। ইঁহার শ্বেতবর্ণ বৈরোচনের দ্যোতক।

অগ্নি ॥ অগ্নি কোণের অধিপতি অগ্নিদেব রক্তবর্ণ, একমুখ, দ্বিভুজ এবং ছাগ বাহন। দুইটি হস্তে যজ্ঞ পাত্র স্রুব ও কমণ্ডলু ধারণ করেন। ইঁহার লাল রং অমিতাভের দ্যোতক।

নৈর্ঋতি ॥ নৈর্ঋতি কোণের অধিপতি নির্ঋতি নীলবর্ণ, একমুখ, দ্বিভুজ এবং শববাহন। দুইটি হস্তে খড়্গ ও খেটক ধারণ করেন। ইনি রাক্ষসদের রাজা এবং ইঁহার নীলবর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

বায়ু ॥ বায়ু কোণের অধিপতি বায়ুদেব নীলবর্ণ, এক মুখ, দ্বিভুজ এবং হরিণবাহন। দুই হস্ত একত্র করিয়া বায়ুপুট ধারণ করেন। ইঁহার নীলবর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

এই মূল রূপের উপর সময়ে সময়ে দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া মস্তকের উপর অঞ্জলিবদ্ধ রাখা হয়। এই অঞ্জলি দ্বারা দেবতা কুলেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মূল দুই হাতের একটি হাত দিয়া স্ব স্ব প্রজ্ঞা বা শক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। অষ্ট দিক্‌পালগণ সকলেই এইভাবেও কল্পিত হইয়া থাকেন।

খ. ব্রহ্মাদি দশ দেবতা

ব্রহ্মাদি দশজন মুখ্য মুখ্য হিন্দু দেবতাদের বর্ণনা নিষ্পন্নযোগাবলীতে পাওয়া যায়। হিন্দু পুরাণাদিতে ইঁহাদের যে বর্ণন পাওয়া যায় তাহা হইতে বিবরণগুলি প্রায় অভিন্ন। তবে রং আর কুলেশে কিছু ভেদ অবশ্যই দেখা যাইবে। সময়ে সময়ে ইঁহাদের শক্তির সহিত যুগনদ্ধ মূর্তিতেও কল্পনা করা হইয়া থাকে, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এক এক করিয়া মুখ্য দেবতাদের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল:

ব্রহ্মা ॥ হংস বাহন ব্রহ্মদেব পীতবর্ণ, চতুর্মুখ ও চতুর্ভুজ। দুইটি মূল হস্তে অক্ষসূত্র ও পদ্ম ধারণ করিয়া হৃৎপ্রদেশে অঞ্জলি মুদ্রা প্রদর্শন করেন।

অপর দুইটি হাতে দণ্ড ও কমণ্ডলু থাকে। ইঁহার পীতবর্ণ রত্নসম্ভবের দ্যোতক।

বিষ্ণু ॥ গরুড়বাহন বিষ্ণুদেব কৃষ্ণবর্ণ এবং চতুর্ভুজ। দুইটি প্রধান ভুজে চক্র ও শঙ্খ ধারণ করিয়া মস্তকোপরি অঞ্জলি মুদ্রা প্রদর্শন করেন। অপর দুইটি হাতে গদা ও ধনু ধারণ করেন। ইঁহার কৃষ্ণবর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

মহেশ্বর ॥ বৃষভোপরি মহেশ্বর শুভ্রবর্ণ ও চতুর্ভুজ। তাঁহার মাথার জটায় চন্দ্র শোভা পান। দুইটি প্রধানহস্তে মাথায় অঞ্জলি ধারণ করেন এবং অপর দুইটি হাতে ত্রিশূল এবং কপাল ধারণ করেন। তাঁহার শুভ্রবর্ণ বৈরোচনের দ্যোতক।

কার্তিকেয় ॥ ময়ূরোপরি কার্তিকেয় রক্তবর্ণ, ষন্মুখ ও চতুর্ভুজ। দুইটি দক্ষিণ হস্তে শক্তি শেল এবং বজ্র ধারণ করেন এবং দুইটি বামহস্তে কুক্কুট বা মুরগি ধারণ করেন। একটি দক্ষিণ ও একটি বামহস্তে মাথায় অঞ্জলি প্রদর্শন করেন। ইহার রক্তবর্ণ অমিতাভের দ্যোতক।

বারাহী ॥ বারাহী কৃষ্ণবর্ণা পেচকের উপর আরূঢ়া এবং চতুর্ভুজা। দুইটি হস্তে রুইমাছ ও কপাল ধারণ করেন। বাকি দুইটি হস্তে মস্তকোপরি অঞ্জলি প্রদর্শন করেন। দেবীর কৃষ্ণবর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

চামুণ্ডা ॥ শবের উপর চামুণ্ডা রক্তবর্ণা এবং চতুর্ভুজা। দুইটি হস্তে কর্ত্রি ও কপাল ধারণ করেন এবং বাকি দুইটিতে অঞ্জলি প্রদর্শন করেন। ইঁহার রক্তবর্ণ অমিতাভের দ্যোতক।

ভৃঙ্গী ॥ ভৃঙ্গীদেব নীলবর্ণ এবং চতুর্ভুজ। দুইটি হস্তে নীল অক্ষসূত্র এবং কমণ্ডলু ধারণ করেন। দ্বিতীয় হস্তদ্বয়ে অঞ্জলি দেখান। ইঁহার নীলবর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

গণপতি ॥ মূষিকের উপর গণপতি শুভ্রবর্ণ, গজমুখ বিশিষ্ট ও চতুর্ভুজ।

দুইটি দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও মোদক এবং দুইটি বামহস্তে পরশু এবং মূলা ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহার শুভ্রবর্ণ বৈরোচনের দ্যোতক।

মহাকাল ॥ মহাকাল কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বিভুজ। দুইটি হাতের একটিতে ত্রিশূল ও অপরটিতে কপাল ধারণ করেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক। ইঁহার অনেক প্রকারের রূপ আছে। এখানে একটিই দেওয়া হইল।

নন্দিকেশ্বর ॥ ইনি কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বিভুজ। মুরজ নামক বাদ্যযন্ত্রের উপর বসিয়া দুই হাতে মুরজ বাদন কবিতে থাকেন। ইহা কৃষ্ণবর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

গ. নয়টি গ্রহদেবতা

বহুকাল হইতে গ্রহের শক্তিকে মানুষ মানিয়া আসিতেছে। যেমন ভারতে তেমনই অন্যান্য দেশে এই গ্রহদের সকলে মানে এবং ভয়ও করে। গ্রহ বলিতে যাহারা গ্রহণ করে বা ধরে অর্থাৎ ভগবানের পুলিশ রূপে যাহারা কার্য করে। গ্রহের রূপ কল্পনাও বহু সহস্র বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের নিকট হইতেই গ্রহগুলির নাম ও রূপ কল্পনা লইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মূল রূপের উপর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে তাহারা ছাড়ে নাই। গ্রহ দেবতাদের কুলেশও বর্ণ অনুযায়ী ঠিক করা হইয়াছিল, এমন কি তাহাদের শক্তিও দেওয়া হইয়াছিল। গ্রহদের যুগনদ্ধ রূপও কল্পনা করা হইয়াছিল। গ্রহদেবতাদের মূর্তি ভারতে, নেপালে, তিব্বতে পাওয়া যায়, এমন কি পিকিং শহরেও তাহাদের ধাতুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থে গ্রহদেবতাদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা নিছক বৌদ্ধমতে কল্পিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই গ্রহদেবতাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে একের পর এক দেওয়া হইল :

আদিত্য ॥ আদিত্য বা সূর্যদেব সাতটি ঘোড়া-টানা রথে বসিয়া থাকেন।

ইনি রক্তবর্ণ ও দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে এবং বামহস্তে সূর্যমণ্ডল ধরিয়া থাকেন। ইঁহার রক্তবর্ণ অমিতাভের দ্যোতক।

সূর্যের সপ্ত তুরগ তাহার সপ্ত রশ্মির প্রতীক হিসাবে কল্পিত হইয়াছিল। অধুনা বিজ্ঞান মতে সূর্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া সাতটি রং দেখা গিয়াছে। এই সাত বর্ণের সাতটি রশ্মিকে সংক্ষেপে vibgyor বলা হয়। সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দু বৌদ্ধদের এই সপ্তরশ্মি বিশ্লেষণ করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। এতদিন উহা কুসংস্কার বলিয়া চলিত, এখন সেই পুরাতন কুসংস্কার বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। পুরাতন কুসংস্কারগুলিও যে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল সে কথা যত শীঘ্র বোধগম্য হয় ততই মানবের পক্ষে মঙ্গালজনক।

চন্দ্র ॥ চন্দ্র হংসের উপর বসিয়া থাকেন। ইনি শুভ্রবর্ণ এবং দ্বিভুজ। দক্ষিণে ও বামে পদ্মোপরি চন্দ্রমণ্ডল ধারণ করেন। ইঁহার শুভ্র বর্ণ বৈরোচনের দ্যোতক।

মঙ্গাল ॥ ভূমিপুত্র মঙ্গাল ছাগলের উপর বসিয়া থাকেন। ইনি রক্তবর্ণ ও দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে মাংস কাটিবার কুঠার ধারণ করেন এবং বামহস্তে ধৃত মানুষের কাটামুণ্ড ভক্ষণের অভিনয় করিয়া থাকেন। ইঁহার রক্তবর্ণ অমিতাভের দ্যোতক। মঙ্গাল লড়াইয়ের গ্রহ। ইনিই পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ আনয়ন করিয়া ব্যাপকভাবে মনুষ্যকুল ক্ষয় করিয়া থাকেন।

বুধ ॥ বুধগ্রহ পদ্মের উপর বসিয়া থাকেন। ইনি পীতবর্ণ এবং দ্বিভুজ। ইঁহার একহাতে ধনু ও আর একহাতে শর থাকে। দেবতার পীতবর্ণ রত্নসম্ভবের দ্যোতক।

বৃহস্পতি ॥ বৃহস্পতি বা গুরুগ্রহ ভেকের উপর বসিয়া থাকেন, কখনও বা মাথার খুলির উপরও বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। ইনি গৌরবর্ণ এবং

দ্বিভুজ। এক হাতে অক্ষসূত্র ও অপর হাতে কমণ্ডলু থাকে। ইঁহার গৌরবর্ণ বৈরোচনের দ্যোতক। গুরু সুখকারক গ্রহ বলিয়া পরিগণিত।

শুক্র ॥ শুক্রগ্রহ কমলের উপর বসিয়া থাকেন। ইঁহার বর্ণ শুভ্র এবং ইনি দ্বিভুজ। একটি হাতে অক্ষসূত্র ও অপর হাতে কমণ্ডলু ধারণ করেন। ইঁহার শুক্লবর্ণ বৈরোচনের দ্যোতক।

শনি ॥ শনিগ্রহের বাহন একটি কচ্ছপ। ইনি কৃষ্ণবর্ণ এবং দ্বিভুজ। দুইটি হাত দিয়া দণ্ড ধরিয়া থাকেন। ইঁহার কৃষ্ণবর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক। শনি দুঃখকারক গ্রহ বলিয়া পরিগণিত।

রাহু ॥ রাহুগ্রহের বর্ণ রক্তমিশ্রিত কৃষ্ণ এবং ইনি দ্বিভুজ। দক্ষিণ ও বাম হস্তে সূর্য এবং চন্দ্রকে ধরিয়া রাখেন। রাহু মৃত্যু দেবতা। একটি বাক্যে বলে—'রাহুস্তু বলবান্ মৃতৌ'। ইঁহার কৃষ্ণবর্ণ অক্ষোভ্যের দ্যোতক।

কেতু ॥ কেতুগ্রহ কৃষ্ণবর্ণ এবং দ্বিভুজ। একটি হাতে খড়্গ ধারণ করেন এবং অপর একটিতে নাগপাশ বা সর্প নির্মিত পাশ ধারণ করেন। শাস্ত্রে বলে ঐকাহিক, দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক, আদি ম্যালেরিয়া জ্বরাদি কেতুই প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইঁহার কৃষ্ণবর্ণ অক্ষোভ্য ধ্যানীবুদ্ধের দ্যোতক।

ঘ. অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র দেবতা

সাতাশটি নক্ষত্রের নাম বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের দেবতাদের নাম বেদাঙ্গ জ্যোতিষে পাওয়া যায়। নক্ষত্রের নাম এবং তাহাদের দেবতাদের গুণকর্মের বিবরণ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়। জ্যোতিষের মতে ২৭ প্রকারের জীব এই সাতাশ নক্ষত্র হইতে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে। এক-একটি নক্ষত্রের আবার চারিটি করিয়া পাদ বা অংশ আছে। সাতাশটি নক্ষত্রকে পাদে পরিণত করিলে ১০৮টি হয়। অতএব সূক্ষ্মভাবে এই ১০৮ প্রকারের জীব সর্বদা জন্মিতেছে এবং

মরিতেছে। তাহাদের উৎপত্তি ১০৮টি নক্ষত্র পাদ হইতে।

বৈদিক সাহিত্যে ২৭টি নক্ষত্রের ২৭টি দেবতা কল্পিত হইয়াছিল, যথা কৃত্তিকার অগ্নি, রোহিণীর প্রজাপতি, মৃগশিরার সোম, আর্দ্রার রুদ্র ইত্যাদি। এই সকল দেবতাগুলির অনেকে বেদের সূক্তেরও দেবতা। বেদে অগ্নিদেবতার বর্ণন হইতে বুঝিতে হইবে, যখন সূর্য কৃত্তিকায় উপস্থিত হন, সেই অবস্থারই বর্ণনা হইতেছে।

বজ্রযানে নক্ষত্রগুলি দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাহাদের রূপে বা মূর্তিতে কোনো রূপ ভেদ দেখা যায় না। তবে সকলেরই বর্ণে বিশেষত্ব আছে। সকল দেবীই একমুখা ও দ্বিভুজা এবং সৌম্যদর্শনা। তাহাদের দুইটি হস্ত হৃৎপ্রদেশে অঞ্জলি মুদ্রা বন্ধ থাকে। দেবীদের সংখ্যা আঠাশ। সাতাশ নক্ষত্রের উপর একটি অভিজিৎ নক্ষত্র যোগ করিয়া সংখ্যা আঠাশে তোলা হইয়াছে। নক্ষত্র দেবীদের বর্ণ নীচে দেওয়া হইল। এই বর্ণ হইতে কুলেশ নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

	নক্ষত্র	বর্ণ	কুলেশ
১	অশ্বিনী	শুভ্র	বৈরোচন
২	ভরণী	হরিৎ	অমোঘসিদ্ধি
৩	কৃত্তিকা	হরিৎ	অমোঘসিদ্ধি
৪	রোহিণী	রক্তশ্বেত	বৈরোচন
৫	মৃগশিরা	নীল	অক্ষোভ্য
৬	আর্দ্রা	পীত	রত্নসম্ভব
৭	পুনর্বসু	পীত	রত্নসম্ভব
৮	পুষ্যা	হরিৎ	অমোঘসিদ্ধি
৯	অশ্লেষা	শ্বেত	বৈরোচন

	নক্ষত্র	বর্ণ	কুলেশ
১০	মঘা	পীত	রত্নসম্ভব
১১	পূর্বা ফাল্গুনী	হরিৎ	অমোঘসিদ্ধি
১২	উত্তরা ফাল্গুনী	হরিৎ	অমোঘসিদ্ধি
১৩	হস্তা	শ্বেত	বৈরোচন
১৪	চিত্রা	হরিৎ	অমোঘসিদ্ধি
১৫	স্বাতী	পীত	রত্নসম্ভব
১৬	বিশাখা	নীল	অক্ষোভ্য
১৭	অনুরাধা	হরিৎ	অমোঘসিদ্ধি
১৮	জ্যেষ্ঠা	পীত	রত্নসম্ভব
১৯	মূলা	পীত	রত্নসম্ভব
২০	পূর্বাষাঢ়া	নীল	অক্ষোভ্য
২১	উত্তরাষাঢ়া	শ্বেত	বৈরোচন
২২	শ্রবণা	শ্বেত	বৈরোচন
২৩	ধনিষ্ঠা	নীল	অক্ষোভ্য
২৪	শতভিষা	পীত	রত্নসম্ভব
২৫	পূর্বা ভাদ্রপদা	হরিৎ	অমোঘসিদ্ধি
২৬	উত্তরা ভাদ্রপদা	পীত	রত্নসম্ভব
২৭	রেবতী	শ্বেত	বৈরোচন
২৮	অভিজিৎ	হরিৎ	অমোঘসিদ্ধি

৬. মাসদেবতা

কাল-সূচক নানা প্রকার দেবতাদের কল্পনার কথা শুনা যায়, যথা প্রভব বিভবাদি ষাটটি সংবৎসরের দেবতা; বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের দেবতা, প্রতিপদাদি ষোলোটি তিথির দেবতা, গ্রীষ্মাদি ছয়টি ঋতুর দেবতা, রবিবার আদি সাতটি বারের দেবতা, ইত্যাদি নানা প্রকার কালবাচক দেবতার কথা শুনা যায়। কিন্তু ইঁহাদের ধাতুতে বা প্রস্তরে নির্মিত মূর্তি বড়ো একটা দেখা যায় না। ষষ্টিপূর্তি, ভীমরথ বা উগ্ররথ শান্তিতে এই সকল কালবাচক দেবতার ছোটো ছোটো ধাতুমূর্তি করিবার একটা রীতি পূর্বে ছিল। এখন আর সে সব হয় না, লোকের বিশ্বাসও নাই আর অর্থও নাই। পিকিং শহরে যে সকল বৌদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে মাস-দেবতা, তিথিদেবতা এবং ঋতুদেবতার মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কালচক্রতন্ত্রে এই সময়বাচক দেবতাদের কিছু কিছু ধ্যান বা বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। এখানে সেইজন্য তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে। প্রথমে মাসবাচক দেবতাদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। নিষ্পন্নযোগা-বলীতে কালচক্র মণ্ডলে এই কালবাচক দেবতাদের উল্লেখ আছে।

এই মণ্ডলে মাসের নাম দ্বাদশটি এবং তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের দ্বাদশটি নাম করা হইয়াছে। শেষোক্ত দেবতাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে মাস, নাম ও দেবতা নাম দেওয়া হইল:

	মাস	অধিপতি
১	চৈত্রমাস	নির্ঋতি
২	বৈশাখ মাস	বায়ু
৩	ফাল্গুন মাস	যম
৪	জ্যৈষ্ঠ মাস	অগ্নি

	মাস	অধিপতি
৫	আষাঢ় মাস	ষন্মুখ
৬	পৌষ মাস	কুবের
৭	আশ্বিন মাস	শত্রু বা ইন্দ্র
৮	কার্তিক মাস	ব্রহ্মা
৯	অগ্রহায়ণ মাস	রুদ্র
১০	শ্রাবণ মাস	সমুদ্র
১১	ভাদ্র মাস	গণেশ
১২	মাঘ মাস	বিষ্ণু

কখনও কখনও এই দেবতাদের শক্তি সহিত কল্পনা করা হয়। সে ক্ষেত্রে ইহাদের চারিটি হস্ত থাকে এবং সেই হস্তগুলিতে তাহাদের স্ব স্ব চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়।

ইহা ছাড়া তিথি দেবতাদের মানা হইয়াছে। অমাবস্যা লইয়া ষোলোটি তিথি হয়। সকলেরই রূপ আছে কিন্তু তাহাদের পূরা রূপ কল্পনা করিবার উপযোগী মালমসলা অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই।

চ বলভদ্রাদি চতুর্দেবতা

চারিজন আরও হিন্দু-দেবতার বিবরণ নিষ্পন্নযোগাবলী হইতে পাওয়া যায়। ইঁহারা কামদেবের সহচর রূপে আবির্ভূত হইতেন। ইঁহাদের নাম বলভদ্র, জয়কর, মধুকর এবং বসন্ত। নিম্নে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল

বলভদ্র ॥ এই বলভদ্রকে কৃষ্ণের ভ্রাতা বলরাম বলিয়াই মনে হয়। ইঁহার বর্ণ শুভ্র এবং ইনি চতুর্ভুজ। ইঁহার বাহন কুঞ্জর। দুইটি হস্তে খড়্গ এবং লাঙল ধারণ এবং বাকি দুইটি হস্তে ধনু ও মদ্যের পাত্র থাকে।

বলরাম কৃষিকর্মের দেবতা ও তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণ দুগ্ধশিল্পের দেবতা বলিয়া মনে হয়। এই দুইটির হ্রাস ও বৃদ্ধির উপর সারা জগতের সুখদুঃখ নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়া তাঁহাদের মূর্তি কল্পনা করা অসম্ভব নহে।

জয়কর ॥ কোকি-লবাহিত রথে জয়কর বসিয়া থাকেন। ইঁহার বর্ণ বোধ হয় অপরাপর বলভদ্রাদি দেবতার ন্যায় শুভ্র। ইঁহার হস্ত চারিটি, দুইটি দক্ষিণ হস্তে ফুলের মালা এবং শর ধারণ করেন এবং দুইটি বাম-হস্তে পানপাত্র এবং ধনু ধারণ করেন।

মধুকর ॥ শুক-বাহিত রথে মধুকর বসিয়া থাকেন এবং তাঁহার বর্ণ শুভ্র। তিনি চতুর্ভুজ। দুইটি দক্ষিণ হস্তে মকরাঙ্কিত ধ্বজা এবং শর ধারণ করেন। দুইটি বামহস্তে পানপাত্র এবং ধনু ধারণ করিয়া থাকেন।

বসন্ত ॥ বসন্ত প্লবঙ্গাবাহন অর্থাৎ বানরের উপর বসিয়া থাকেন। ইনি শুভ্রবর্ণ এবং চতুর্ভুজ। দুইটি দক্ষিণ হস্তে শর এবং অসি ধারণ করেন। দুইটি বামহস্তে ধনু পানপাত্র থাকে।

ছ. যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব এবং বিদ্যাধরগণ

যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, নাগ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ইত্যাদির নাম শুনিলেই এগুলি রূপকথা বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ ও হিন্দু ভূতডামরতন্ত্রে ইঁহাদের মন্ত্র ও উপাসনাদি করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার প্রক্রিয়া দেওয়া আছে। ইঁহাদের সিদ্ধ করিবার প্রক্রিয়া যদিও কষ্টকর কিন্তু বিশেষ সময়সাধ্য নহে। প্রীত হইলে ইঁহারা সাধকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন, কথাবার্তা কহেন এবং অভিলষিত সিদ্ধি প্রদান করিয়া চলিয়া যান। কর্ণ-পিশাচসিদ্ধ লোক এখনও দু-একটিকে দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কেহ আসিলে তাহার নাম, ধাম, কী কার্যে আসিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ কী ইত্যাদি পিশাচ সিদ্ধের কর্ণে বলিয়া দেন এবং তাহা সর্ব প্রকারে সত্য হইয়া থাকে। যক্ষাদি যে

কোনো বিশেষ জাতি কিংবা কোনো বিশেষ দেশের অধিবাসী তাহা একেবারেই মনে হয় না। ইঁহারা দেবতাদের অপেক্ষা নীচু স্তরের ক্ষুদ্র দেবতা বিশেষ। ইঁহাদের চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। ইঁহাদের মূর্তি কল্পনা করা হইয়াছে এবং নানাস্থানে ইঁহাদের প্রস্তর বা ধাতুনির্মিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পিকিঙে এই সব ক্ষুদ্র দেবতাদের অনেক ধাতুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

তন্ত্রশাস্ত্র হইতে ইঁহাদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সংক্ষিপ্তসার এখানে দেওয়া হইতেছে।

অষ্টযক্ষরাজ ॥ যক্ষেরা জগতের ধনসামগ্রী রক্ষা করেন এবং প্রীত হইলে তাঁহারা ধনরত্ন বর্ষণ পর্যন্ত করিয়া থাকেন। যক্ষদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হইলেন কুবের। তিনি অপরাপর যক্ষগণের সহিত উত্তরদিশায় বসবাস করেন। তাঁহার রাজধানীর নাম অলকাপুরী এবং উক্ত স্থান কৈলাসক্ষেত্রের নিকটবর্তী বলিয়া কল্পনা করা হয়। মেঘদূতের যক্ষকে এই স্থান হইতে নির্বাসন দেওয়া হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া নিষ্পন্নযোগাবলীতে আট জন যক্ষরাজের নাম পাওয়া যায়। সকলেই দেখিতে এক প্রকারের। সকলেরই দুইটি হাত এবং সকলেরই এক হাতে বীজপূরক ফল ও অন্য হাতে একটি নকুল বা বেজি থাকে। ইঁহাদের বর্ণে কিছু ভেদ আছে এবং সেইহেতু তাহাদের বর্ণানুযায়ী কুলেশেও কিছু ভেদ আছে। যথা:

	যক্ষ	বর্ণ	কুল
১	পূর্ণভদ্র	কৃষ্ণ	অক্ষোভ্যকুল
২	মণিভদ্র	পীত	রত্নসম্ভবকুল
৩	ধনদ	রক্তবর্ণ	অমিতাভকুল

	যক্ষ	বর্ণ	কুল
৪	বৈশ্যবর্ণ	পীত	রত্নসম্ভবকুল
৫	চিবিকুণ্ডলী	লাল	অমিতাভকুল
৬	কেলিমালী	হরিৎ	অমোঘসিদ্ধিকুল
৭	সুখেন্দ্র	পীত	রত্নসম্ভবকুল
৮	চলেন্দ্র	পীত	রত্নসম্ভবকুল

বীজপুর এবং নকুল দুইটি পূর্ববর্ণিত জম্ভলদেবতার প্রতীক চিহ্ন। তিনি একজন বিশিষ্ট ধনদেবতা, কাজেই জম্ভলকে যক্ষরূপে গ্রহণ করাই উচিত।

কিন্নর, গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরেরা যক্ষদের মতোই ক্ষুদ্রদেবতা এবং প্রীত হইলে প্রভূত সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। নিষ্পন্নযোগাবলীতে ইঁহাদের নেতাদের সম্বন্ধে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল:

কিন্নর ॥ কিন্নর রাজের কোনো নাম পাওয়া যায় না, কিন্তু ইঁহার মূর্তি-কল্পনা দেওয়া আছে। ইহা হইতে দেখা যায় কিন্নররাজ রক্তমিশ্রিত গৌরবর্ণ এবং দুইটি হাতে বীণা বাদনে তৎপর থাকেন। ইঁহার গৌরবর্ণ বৈরোচনের দ্যোতক।

গন্ধর্ব ॥ গন্ধর্বদিগের রাজার নাম পঞ্চশিখ। ইনি পীতবর্ণ এবং ইনিও দুই হাতে বীণা বাদন করেন। ইঁহার পীতবর্ণ রত্নসম্ভব কুলের দ্যোতক।

বিদ্যাধর ॥ বিদ্যাধরদিগের রাজার নাম সর্বার্থসিদ্ধ। ইনি গৌরবর্ণ এবং দুইটি হাতে কুসুমমালা ধরিয়া থাকেন। ইঁহার গৌরবর্ণ বৈরোচন-কুলের দ্যোতক।

জ. সরস্বতী

আর-একটি দেবতার কথা এখানে না বলিলে গ্রন্থ অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি হিন্দুদিগের বিদ্যার দেবতা সরস্বতী। বজ্রযানে এই হিন্দু দেবতার

নানা প্রকার রূপ কল্পনা হইয়াছিল এবং ইঁহাকে নানাপ্রকার নূতন নামে বিভূষিত করা হইয়াছিল। তাঁহার সর্বশুদ্ধ পাঁচটি নাম বজ্রযান তন্ত্রে পাওয়া যায় : মহা সরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রশারদা, আর্য সরস্বতী ও বজ্র সরস্বতী। এই সকল প্রকার রূপের বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে বলিয়া মাত্র একটি রূপ এখানে বর্ণিত হইল।

বজ্রশারদা রূপে সরস্বতী শুভ্রপদ্মের উপর বসিয়া থাকেন। তিনি দ্বিভুজা এবং দক্ষিণ হস্তে পদ্ম এবং বামহস্তে পুস্তক ধারণ করেন। তাঁহার সঙ্গে কখনও কখনও চারিটি আবরণ-দেবতা, প্রজ্ঞা, মেধা, স্মৃতি ও মতিকে দেখা যায়।

উপসংহার

মহাপণ্ডিত অভয়াকর গুপ্ত বলিয়াছেন, বজ্রযানে দেবতামূর্তির সম্পদ অমেয় অর্থাৎ অপরিমেয়, অসংখ্যেয়। বাস্তবিক বৌদ্ধতন্ত্রাদির অধ্যয়ন করিলে তাঁহার কথাই সত্য বলিয়া মনে হয়। যাহা দুই একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতেই মূর্তি সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখনও অসংখ্য তন্ত্রপুস্তক অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। যখন সমস্ত পুথি প্রকাশিত হইবে, তখনই বজ্রযান দেবসংঘ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে। তাহার আগে নহে।

বারিধির জলবুদ্‌বুদের ন্যায় দেবতা অসংখ্য। অনন্তচিত্তের আবেগে সমুদ্রের ন্যায় শূন্যতত্ত্বের সহিত সংঘাতে বুদ্‌বুদের ন্যায় অনন্ত দেবতার উদ্ভব হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। কাজেই মূর্তিশাস্ত্রের শেষ যে কোনোদিন দেখা যাইবে তাহা বোধ হয় না। অদ্যাবধি যাহা জানা গিয়াছে তাহারই একটা বিবরণ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। ভারতের পুরাতন সংস্কৃতির এই ধারাটি বিশেষ মনোরম, চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয়। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে কোনো জাতিকে কিংবা কোনো ধর্মাবলম্বীদের চিনিতে হইলে আগে তাহাদের উপাস্য দেবতাদিগকে চিনিতে হয়।

বজ্রযানের দেবসংঘে যেরূপ সুন্দর একটি বাঁধুনি দেখা যায় অন্যান্য দেবসংঘে যথা হিন্দু ও জৈন দেবসংঘে সেরূপ বাঁধুনি দৃষ্টিগোচর হয় না। বজ্রযানের কুলপদ্ধতি একটি মৌলিক এবং নূতন জিনিস। সর্বসমেত পাঁচটি কুল দ্বেষ, মোহ, রাগ, চিন্তামণি ও সময়, ইহারাই কাম এবং মোক্ষ সাধন করিতে সমর্থ। এ কথা আদিতন্ত্র গুহ্যসমাজে বলিয়াছে। কাজেই মূর্তিবিদের প্রধান কর্তব্য সকল দেবতারই যথাযথ কুলনির্ণয় করা। কুলনির্ণয় তিন প্রকারে হইতে পারে। প্রথমত ও প্রধানত শরীরের বর্ণ দেখিয়া

কুলনির্ণয় করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, দেবতার অবস্থান বা দিশা হইতে কুলনির্ণয় করিতে হয়। যদি উত্তরে দেবতা অবস্থান করেন তাহা হইলে তিনি অমোঘসিদ্ধি বা সময় কুলের। যদি পশ্চিমে দেবতা অবস্থান করেন তাহা হইলে তাঁহার কুল হইবে অমিতাভের বা রাগকুল। তৃতীয়ত, মূর্তির মাথার উপর ক্ষুদ্র ধ্যানীবুদ্ধ মূর্তি দেখিয়া কুল নির্ণয় করিতে হয়। ধ্যানীবুদ্ধ যদি সমাধি মুদ্রাস্থ হন, তাহা হইলে মুখ্য দেবতা অমিতাভ কুলের, যদি ভূস্পর্শ মুদ্রান্বিত হন তাহা হইলে কুলদেবতা অক্ষোভ্য বুঝিতে হয়। এই-ভাবেও দেবতার কুল নির্ণয় হয়। এই কুল বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া সর্বত্র যত্ন করিয়া কুল নির্ণয় করিবার চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। দুই একটি স্থানে পুনরুক্তি পরিহার করা অবশ্য সম্ভব হয় নাই। তাহার কারণ দেবতাদের পৃথক শ্রেণি বা বর্গে অবস্থিতি।

পঞ্চকুলের আদিম উৎপত্তি স্থান গুহ্যসমাজ তন্ত্র। ভাগ্যক্রমে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গুহ্যসমাজের প্রথম পরিচ্ছেদেই পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ, তাহাদের পাঁচটি শক্তি এবং তাহাদের মণ্ডলের চারিটি দ্বারপালের উৎপত্তি কথা ও মন্ত্রাদি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির কর্তার নাম নাই, কারণ ইহা সঙ্গীতি বা ভগবদ্ বচন। তবে ইহার প্রস্তুতিতে বৌদ্ধ পণ্ডিত অসঙ্গের যে হাত ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। চতুর্থ শতাব্দীর আদিভাগে এই তন্ত্রখানি রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামে একখানি বৌদ্ধ পূজা পদ্ধতির পুস্তক ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে নানা প্রকার দেবদেবী, মুদ্রা, উপাসনাদির কথা আছে, কিন্তু কোথাও পঞ্চকুলের বা পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের কথা নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় মঞ্জুশ্রীমূলকল্প গুহ্যসমাজের কিঞ্চিৎ পূর্বেকার পুস্তক। চতুর্থ শতাব্দী হইতে বাংলায় মুসলমান আক্রমণের সময় পর্যন্ত তন্ত্রের অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছিল, অগণিত দেবদেবীর কল্পনা হইয়াছিল। অসংখ্য সাধক সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভূরি ভূরি প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত

গ্রন্থসূচি

সংস্কৃত

'অদ্বয়বজ্র-সংগ্রহ': সম্পাদক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রকাশক, গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, বরোদা।

'গুহ্যসমাজ তন্ত্র': সম্পাদক , বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, প্রকাশক , গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, বরোদা।

'নিষ্পন্নযোগাবলী' : সম্পাদক, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, প্রকাশক, গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, বরোদা।

'সাধনমালা' : সম্পাদক , বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, প্রকাশক, গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ, বরোদা।

ইংরেজি

Bhattacharyya, B. : *Indian Buddhist Iconography,* Oxford University Press. 1924

Bhattasali, N. K. : *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum.* Dacca, 1929.

Clarke. Walter Eugene : *Two Lamaistic Pantheons,* 2 vols. Cambridge, Mass. U.S.A.

Fouche : A Etude sur l' Iconographie Bouddhique de *l'Inde.* Paris 1900, 1905.

Getty, Alice : *The Gods of Northern Buddhism,* Oxford University Press, 1914, and subsequent edition.

পরিশিষ্ট

মুদ্রা ও আসন পরিচিতি

অঞ্জলিমুদ্রা	দুটি হাত বদ্ধ অবস্থায় বুকের কাছে রেখে ভক্তি প্রদর্শন করা হয় এই মুদ্রায়। দুহাতের তালু এবং উঁচিয়ে রাখা আঙুলগুলোকে পরস্পর যুক্ত রেখে এই মুদ্রাটি ধারণ করে রাখে ষডক্ষরী লোকেশ্বর এবং অবলোকিতেশ্বরের বিভিন্ন তান্ত্রিক দেবরূপ।
অভয়মুদ্রা	যে কোনও রকম ভীতি থেকে রক্ষা করা বোঝাতে এই মুদ্রা প্রদর্শিত হয়। ডান হাতের তালু দর্শকের দিকে রেখে আঙুলগুলোকে আকাশের দিকে উঁচু করে রাখা হয় এই মুদ্রায়। মত্তহস্তী নালগিরিকে বশে এনে বুদ্ধ এই মুদ্রা দেখিয়েছিলেন।
অর্ধপর্যঙ্ক	এই মুদ্রাকে মহারাজলীলা বা লীলাসনও বলা হয়। যে পাদপীঠে দেবতা বসে থাকেন দুটি পা সেখানেই স্থাপিত। তবে একটি পা হাঁটু মোড়া অবস্থায় উঠিয়ে রাখা হয়। অন্য পা-টি আসন-পিঁড়ি করে পাদপীঠের সঙ্গে একই রেখায় বিন্যস্ত।
আলীঢ় এবং প্রত্যালীঢ়	এ দুটি পদভঙ্গা যুদ্ধের এবং নাচের সময় ব্যবহার করা হয়। ডান পা এগিয়ে রেখে বাঁ পা পিছনে মুড়ে বসার ভঙ্গি আলীঢ়; আর বাঁ পা প্রসারিত করে ডান পা'টি পিছনে গুটিয়ে রাখলে সেই উপবেশন প্রক্রিয়াকে প্রত্যালীঢ় বলে। যম, হেবজ্র এবং কালচক্র মূর্তিতে এই পদভঙ্গি দেখা যায়।
ইয়ব্-ইয়ুম্	শব্দটি তিব্বতি। কোনও দেবতা যখন তাঁর শক্তি বা দেবীকে মুখোমুখি আলিঙ্গণ করেন তখন এই ভঙ্গিকে বলে ইয়ব্-ইয়ুম্ বা যুগনদ্ধ। বলা হয়ে থাকে, প্রজ্ঞা এবং মেধার মিলনে যে

শূন্যতা বা মহাসুখের সৃষ্টি হয় তারই প্রতীক এই দেবদেবীর শারীরিক মিলন বা যুগনদ্ধ রূপ।

করণমুদ্রা — তর্জনী এবং কনিষ্ঠা আঙুল দুটি উত্তোলিত অবস্থায় রেখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি দিয়ে হাতের অন্য আঙুলগুলোকে চেপে রাখলে এই মুদ্রা তৈরি হয়। যম এবং একজটা দেবতার মুদ্রা এটি।

ধর্মচক্রপ্রবর্তন অথবা ব্যাখানমুদ্রা — সারনাথে তাঁর পাঁচ শিষ্যকে ধর্মপ্রচার করার সময় বুদ্ধদেব এইমুদ্রাটি দেখান। ধর্মের ব্যাখ্যান দিতেই এই মুদ্রাকে ব্যবহার করা হয়। দুটি হাত বুকের কাছে রেখে অনামিকা ও মধ্যমা দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুল ছুঁলে এবং বাঁ-হাতটি ডান হাতকে ঢেকে রাখলে তৈরি হয় এই মুদ্রা। গৌতমবুদ্ধ, ধ্যানীবুদ্ধ বৈরোচন, বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় এবং মঞ্জুশ্রী এই মুদ্রা প্রদর্শন করেন।

ধারণী বা ধারিণী — অর্থহীন বেশ কিছু এলোমেলো অক্ষর এবং কখনও কয়েকটি অর্থযুক্ত শব্দ মিলিয়ে যে মন্ত্রমালা সাধন প্রক্রিয়ায় উচ্চারণ করা হয় তাকে ধারণী বলে। ধারণী সংগ্রহ গ্রন্থে দেবতাদের সন্তোষ বিধানে এই সব মন্ত্রমালা লেখা রয়েছে।

ধ্যানমুদ্রা — উপাসনার সময় বা ধ্যানে বসলে যখন দুটি হাত একে অপরের ওপর স্থাপিত হয়ে কোলের কাছে থাকে তখন তাকে বলে ধ্যানমুদ্রা। এই মুদ্রায় আঙুলগুলো গুটিয়ে থাকবে না। বরং হাতের চেটো ওপরদিকে রাখতে হয়। ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ, গৌতমবুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর মুদ্রা এটি।

বজ্রযান — বৌদ্ধধর্মের অন্তিম লক্ষ্য শূন্যতা বা নির্বাণ। সেই শূন্যতাকে [illegible] ..এছে দুর্ভেদ্য বজ্রের মতো। হীনযান, মহাযান [illegible] দুই মতন্তরের পর বজ্রযান মতের প্রসার ঘটে ব্যাপকভাবে। বজ্রযান-বিশ্বাসে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের উদ্ভব হয়েছে আদি বুদ্ধ থেকে। এছাড়া পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধের কুল বা

বংশও কল্পিত হয়েছে যা থেকে বৌদ্ধ দেবদেবীর আবির্ভাব। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মে সব পুরুষ দেবতারই একটি করে শক্তি কল্পনা করা হয়েছে।

বজ্রপর্যঙ্কাসন — এই আসন বা বসার অবস্থানটি বজ্রাসন নামেও পরিচিত। যোগের ভঙ্গিতে বসে দুটি পা একে অপরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পায়ের পাতা দুটিকে দৃশ্য করতে হবে এই আসনে। ধ্যানাসনের সঙ্গে বজ্রাসনের পার্থক্য হল প্রথমটিতে পায়ের পাতাদুটি লুকোনো থাকবে ভিতরদিকে।

বজ্রহুংকারমুদ্রা — দুটি হাত আড়াআড়িভাবে বুকের কাছে রেখে একহাতে বজ্র অন্য হাতে ঘন্টা ধারণ করে বৌদ্ধ দেবদেবীরা বজ্রহুংকার মুদ্রা প্রদর্শন করেন। বজ্রধর, সম্বর এবং ত্রৈলোক্যবিজয়-এর মতো দেবতাদের এই মুদ্রায় চিহ্নিত করা যায়।

বরদমুদ্রা — বরদান করা হয় এই মুদ্রায়। ডান হস্তটি শরীরের পাশে ঝুলিয়ে আঙুলগুলো টান টান করে দর্শকের দিকে প্রদর্শন করা হয়। হাতে কোনও রত্ন বা মনি থাকলে সেই মুদ্রাকে বলা হয় রত্নসংযুক্ত বরদমুদ্রা। বৌদ্ধদেবী তারা, গৌতমবুদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর প্রচলিত মুদ্রাও বরদ।

ভূমিস্পর্শমুদ্রা — সিদ্ধিলাভের সময় বোধিবৃক্ষের নীচে বসে মাতা ধরিত্রীকে সাক্ষী রেখে ভূমি স্পর্শ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। এই মুদ্রায় ডান হাতটি ডান হাঁটুকে স্পর্শ করে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে থাকবে ভূমির আসন। হাতের তালুটি ভিতরদিকে প্রদর্শিত হবে।

মণ্ডল — বৃত্তাকারে অঙ্কিত জ্যামিতিক ক্ষেত্র বা দেবদেবীর কল্পিত আসন। মণ্ডলের নানা প্রকোষ্ঠে অন্য দেবদেবীর চিত্রিত রূপকে সঙ্গে করে মধ্যে বিরাজ করেন মূল উপাস্য দেবতা।

মন্ত্রযান — মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পর্যায়ে মন্ত্রযানের শুরু। তান্ত্রিক

রীতি ও আচার অনুষ্ঠান, মন্ত্র, তুকতাক, ডাকিনীবিদ্যা, যাদুশক্তির প্রাধান্য এই সময়ের ধর্মানুষ্ঠানে। তখন ভূত প্রেত, দত্যি দানোয় বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল অতি সহজে নির্বাণলাভের আশায়। ধারণী, মণ্ডল, মুদ্রাবৈচিত্র্য যুক্ত হয় সাধন প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে।

ললিতাসন — মহারাজলীলার মতোই পদস্থাপন কিন্তু একটি পা আসনের ওপর না রেখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যখন দুটি পা চেয়ারে বসার মতো ঝুলে থাকে তখন তাকে বলা হয় ভদ্রাসন।

ষন্মুদ্রা — মানুষের হাড়ে তৈরি ছটি পবিত্র গহনা বা প্রতীকের নাম ষন্মুদ্রা। কণ্ঠিকা, বাজুবন্ধ বা রুচিকা, রত্ন, মেখলা, ভস্ম এবং সূত্রক—এই ছটি অলংকার এবং পরিধান ডাকিনী, একজটা, যমারি এবং যমের প্রিয় বস্তু।